অধিকার
সুরক্ষার
বিষয়টির
সাথে
'সচেতনতা'
শব্দটি
ওতপ্রোতভাবে
জড়িয়ে
আছে।
ভোক্তাসাধারণ
সচেতন না
হলে, তাদের
অধিকার
সুরক্ষা করা
নিঃসন্দেহে
কষ্টসাধ্য।

ভোক্তাস্বার্থ

ষষ্ঠ সংখ্যা ২০০৬ ইং জুলাই সেপ্টেম্বর

ত্রিপুরা সরকার

খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের
ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

ত্রিপুরা সরকার , খাদ্য ,জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক মুখপত্র "**ভোক্তাস্বার্থ**" --**ষষ্ঠ সংখ্যা**

প্রকাশক ঃ অধিকর্তা , খাদ্য ,জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর , আগরতলা ।

প্রকাশ কাল ঃ ত্রৈমাসিক

(জুলাই সেপ্টেম্বর)

২০০৬ ইং

মুদ্রন সংখ্যা - সাতশত পঞ্চাশ

মুদ্রণে ঃ- ত্রিপুরা সরকারী মুদ্রণালয়, আগরতলা ।

জে. সি. নং - ১২৭৮১

" ২০০২ সালে ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ আইন- ১৯৮৬ সংশোধিত হয়েছে। উক্ত সংশোধনীর দ্বারা কিছু ধারার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নূতন কিছু ধারা সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া ভোক্তা আদালতগুলোর আর্থিক পরিধিও বৃদ্ধি করা হয়েছে।"

সম্পাদকীয়--

"ভোক্তাস্বার্থ" ৬ষ্ঠ সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো। ভোক্তাদের সচেতনতার মান উন্নত করার লক্ষ্যে "ভোক্তাস্বার্থ" প্রকাশিত হচ্ছে।

ভোক্তাদের আইনগত অধিকারসমূহ সুরক্ষিত করার মাধ্যমেই ভোক্তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। তবে একথা অনস্বীকার্য যে অধিকার সুরক্ষার বিষয়টির সাথে 'সচেতনতা' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র আইন কিংবা কোনরূপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কারোর অধিকার সুরক্ষা করা যায় না। তাই প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা।

ভোক্তাগণকে সচেতন করার লক্ষ্য সামনে রেখেই "ভোক্তাস্বার্থ" এগিয়ে চলবে-- সকলের শুভকামনা পাথেয় করে।

শুভেচ্ছান্তে--

অমিত বর্মণ রায়

সম্পাদক, ভোক্তাস্বার্থ।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং

ক্রেতাস্বার্থ সুরক্ষায় বিভিন্ন আইন

	নাম	যার মাধ্যমে বলবৎ হয়
১)	কনজ্যুমার প্রটেকশন অ্যাক্ট ১৯৮৬	খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর এবং জেলা ভোক্তা আদালত (ডিস্ট্রিক ফোরাম) রাজ্য ভোক্তা আদালত (স্টেট কমিশন) জাতীয় ভোক্তা আদালত (ন্যাশানাল কমিশন)
২)	এসেনসিয়েল কমোডিটি অ্যাক্ট ১৯৫৫	খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর/আরক্ষা দপ্তর/ জেলা প্রশাসন
৩)	প্রিভেনশন অফ ফুড এডাল্টারেশন অ্যাক্ট ১৯৫৪	স্বাস্থ্য দপ্তর ও পৌরসভা
৪)	স্টান্ডার্স অব ওয়েটস এন্ড মেজারস অ্যাক্ট ১৯৭৬	কন্ট্রোলার ,ওয়েটস্ এন্ড মেজারস ।
৫)	স্ট্যান্ডারস্ অফ এয়েটস এন্ড মেজারস্ (প্যাকেজড কমোডিটিস রুলস,১৯৭৭)	ঐ
৬)	প্রিভেনশন অব ব্ল্যাক মার্কেটিং এন্ড মেইন্টিনেন্স অব সাপ্লাইজ অফ এসেনসিয়েল কমোডিটিস অ্যাক্ট, ১৯৮০	খাদ্য ,জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর /আরক্ষা দপ্তর / জেলা প্রশাসন
৭)	মনোপলিজ এন্ড রেষ্ট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট,১৯৭০	আরক্ষা দপ্তর , জেলা প্রশাসন/ খাদ্য দপ্তর এম আর টি পি কমিশন কে জি মার্গ, নতুন দিল্লী -১১০০০১

কোন্ কোন্ বিষয় ভোক্তা আইনের অধীন

১) যে কোন দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যের গুনমান, ওজন , মূল্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি বা অনিয়ম হয়ে থাকলে

২) পরিষেবা ক্ষেত্রে আপনি বঞ্চিত হলে বা অনিয়ম হলে,
যেমন ঃ- ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, ইন্সুরেন্স, বিদ্যুৎ পরিষেবা , স্বাস্থ্য পরিষেবা (ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখানো, নার্সিং হোম পরিষেবা, প্যাথলজি বা অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ইত্যাদি) টেলিফোন পরিষেবা, যানবাহন/ সড়ক পরিবহন/ রেল/ বিমান পরিষেবা অর্থাৎ যে কোন ধরনের পরিষেবা, যার জন্য আপনি কিছু - অর্থমূল্য দিয়েছেন ।

৩) যদি বিক্রীত দ্রব্য কিংবা বিক্রয়ের জন্য ঘোষিত দ্রব্য জনজীবন ও সম্পত্তির পক্ষে বিপদজনক এবং প্রচলিত কোন সংশ্লিষ্ট আইন বিরোধী হয়ে থাকে ।

ভোক্তা সংরক্ষণ আইন এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ধারা ঃ-

১) ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হয় । তাই প্রতিবছর ২৪শে ডিসেম্বর দিবসটিকে ''জাতীয় ভোক্তা দিবস'' হিসাবে পালন করা হয় ।

২) উপরোক্ত আইনে বলা হয়েছে যিনি অর্থের বিনিময়ে কোন দ্রব্য ক্রয় করেন অথবা কোন পরিষেবা ভোগ করেন তিনিই একজন ভোক্তা ।

৩) উক্ত আইনে ভোক্তাদের ৬টি অধিকার দেওয়া হয়েছে । আইনগত অধিকারগুলো হল ঃ-
   ক) সেবা নিরাপত্তার অধিকার ,
   খ) তথ্য পাওয়ার অধিকার ,
   গ) পছন্দ করার অধিকার ,
   ঘ) বক্তব্য শোনানোর অধিকার ,
   ঙ) সুবিচার পাওয়ার অধিকার এবং
   চ) ভোক্তা শিক্ষা পাওয়ার অধিকার ।

৪) অর্থের বিনিময়ে কোন দ্রব্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে কিংবা পরিষেবা ভোগ করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হলে, যেকোন ভোক্তা আদালতের দারস্থ হতে পারেন ।

৫) ভোক্তা আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে কোন আইনজীবির সহায়তা প্রয়োজন হয় না ।

৬) ভোক্তা আইন অনুসারে দেশে ত্রিস্তরীয় ভোক্তা আদালত চালু আছে । এগুলি হল ঃ

ক) জাতীয় ভোক্তা আদালত , নূতন দিল্লী ।

খ) রাজ্য ভোক্তা আদালত ।

গ) জেলা ভোক্তা আদালত ।

৭) ভোক্তা আদালতগুলোতে অতি দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি হয় ।

৮) ভোক্তা আদালতগুলো একজন সভাপতি , একজন পুরুষ সদস্য এবং একজন মহিলা সদস্য নিয়ে গঠিত ।

৯) ভোক্তা সংরক্ষণ আইনটি ক্ষতিপূরন মূলক ।

১০) ভোক্তা আদালতগুলো ত্রুটিপূর্ন দ্রব্য সারাই করে দেওয়া , ফেরত নিয়ে পাল্টিয়ে দেওয়া, আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া ইত্যাদির আদেশ দিয়ে থাকেন ।

১১) ভোক্তা আদালতগুলোর বিচারপদ্ধতি অতি সহজ ও সরল এবং একজন ভোক্তা নিজেই নিজের মামলা চালাতে পারেন ।

১২) ভোক্তা আইন অনুসারে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তিকে জাতীয় ভোক্তা আদালতের সভাপতি করা হয় এবং হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তিকে রাজ্য ভোক্তা আদালতের সভাপতি করা হয় । তাছাড়া জেলা আদালতের কোন বিচারপতি হওয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তিকে জেলা ভোক্তা আদালতের সভাপতি করা হয় ।

১৩) উক্ত আইনে ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষায় কেন্দ্রীয় স্তরে ও রাজ্যস্তরে ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষা পরিষদ গঠনের সংস্থান রাখা হয়েছে ।

১৪) উক্ত আইনের ২০০২ সালে সংশোধনী অনুসারে ,(জেলা ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষা পরিষদ গঠনের সংস্থান রাখা হয়েছে ।

১৫) ভোক্তা আদালতগুলো দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ।

১৬) অভিযোগকারীকে সাময়িক সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে মামলা চলাকালীন সময়ে অর্ন্তবর্তী কালীন রায় দেওয়ার সংস্থান উক্ত আইনে রাখা হয়েছে ।

১৭) রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার ভোক্তাদের পক্ষে ভোক্তা আদালত গুলোতে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন ।

১৮) অভিযোগকারীগণ যাতে আরও দ্রুত সুবিচার পেতে পারেন তার জন্যে উক্ত আইনে মামলা নিষ্পত্তি করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ।

১৯) ভোক্তা আদালতগুলোকে প্রথমশ্রেণীর বিচার বিভাগীয় মেজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে . ফলে ভোক্তা আদলতগুলোর আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে ।

২০) জেলা ভোক্তা আদালত ও রাজ্য ভোক্তা আদালত গুলোর আর্থিক ক্ষমতার পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এখন ক্ষতিপূরনের দাবী ২০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হলে জেলা ভোক্তা আদালতে এবং ক্ষতিপূরণের দাবী ১ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে রাজ্য ভোক্তা আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যাবে ।

*ভোক্তা আদালতগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হলো উক্ত আদালত গুলোতে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে থাকে ।

ভোক্তাদের কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ-

আপনি জানেন কি - ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষার জন্য ভোক্তা সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬ ত্রিপুরাতেও বলবৎ আছে ?

ভোক্তা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আছে কি ?
তাহলে আপনি বিনা খরচে ভোক্তা আদালতে শরণাপন্ন হতে পারেন ।
সাদা কাগজে অভিযোগ পত্র দায়ের করতে হয় ।
কোন আইনজীবির সহায়তার প্রয়োজন হয় না।
আপনার মামলা আপনিই চালাতে পারেন ।
মনে রাখবেন আপনার জেলাতেই একটি ভোক্তা আদালত আছে ।

কখন অভিযোগ দায়ের করা যায় ঃ-

ভোক্তা সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬ অনুসারে আপনি লিখিতভাবে ভোক্তা আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে ঃ-

১) যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোন অনিয়ম ঘটে থাকে এবং তার জন্যে ক্রেতা হিসাবে আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ।

২) যদি ক্রয় করা দ্রব্যে ত্রুটি থাকে ।

৩)	যদি কোন পরিষেবার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকে অথবা ভাড়া নেওয়া কোন কিছুতে ঘাটতি বা ত্রুটি থাকে ।

৪)	যদি নির্ধারিত মূল্যের চাইতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠান আপনার কাছ থেকে বেশী মূল্য নিয়ে থাকেন ।

৫)	যদি বিক্রীত দ্রব্য কিংবা বিক্রয়ের জন্য ঘোষিত দ্রব্য জন জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে বিপদজনক এবং প্রচলিত কোনো সংশ্লিষ্ট আইন বিরোধী হয়ে থাকে ।

ভোক্তা সংরক্ষণ আইন অনুসারে কোথায় অভিযোগপত্র দায়ের করবেন ঃ-

ক)	যদি আপনার ক্ষতিপূরনের দাবী কুড়ি লক্ষ টাকা কিংবা তার কম হয় , তবে সংশ্লিষ্ট জেলা ভোক্তা আদালতে (ডিষ্ট্রিক্ট ফোরামে) যে জেলাতে বিরোধের কারণ সৃষ্টি হয়েছে (আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ভাবে) কিংবা যে জেলাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বসবাস করেন অথবা ব্যবসা করেন অথবা যে জেলাতে অভিযুক্ত ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অফিস অথবা আঞ্চলিক অফিস আছে , উক্ত জেলাস্থিত ভোক্তা আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন ।

খ)	আপনার ক্ষতিপূরণের দাবী কুড়ি লক্ষ টাকার বেশী এবং এক কোটি টাকা পর্যন্ত হলে ঃ
সভাপতি , রাজ্য ভোক্তা আদালত (স্টেট কমিশন), রামনগর রোড নং ১,
আগরতলা - ৭৯৯০০১। ফোন নং-- ০৩৮১-২২২ ৫৯৭৫

ক্ষতিপূরণের দাবী এক কোটি টাকার বেশী হলে ঃ-

সভাপতি, ন্যাশানেল কমিশন , পাঁচতলা এ - উইং,
জনপথ ভবন, নয়াদিল্লী- ১, টেলিফোন নং - (০১১) ৩৩১-৭৬৯০ ।

অভিযোগ পত্রে কি কি তথ্য বা বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে ?

১)	অভিযোগকারীর নাম ও পুরো ঠিকানা ।
২)	বিবাদী পক্ষের অর্থাৎ অভিযুক্ত পক্ষের পুরো নাম ও ঠিকানা ।
৩)	দ্রব্য ক্রয় করা অথবা পরিষেবা প্রদানের তারিখ ।
৪)	বিনিময় মূল্য (যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছেন) ।

৫) দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ / যে ধরণের পরিষেবা গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ।

৬) অভিযোগের কারণ/ বিষয়বস্তু ।

৭) বিল/ ভাউচার / পত্রাদি ইত্যাদির প্রতিলিপি ।

৮) কি ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবী করেন ।

গণবন্টন ব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপরেখা

১) দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী চিহ্নিত পরিবারগুলো (বি.পি.এল) প্রতি মাসে পরিবার পিছু পয়ত্রিশ কে.জি. চাউল প্রতি কে জি ছয় টাকা পনের পয়সা দরে রেশন দোকানের মাধ্যমে পাবেন ।

২) অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিটি পরিবার প্রতি মাসে পরিবার পিছু পঁয়ত্রিশ কে জি চাউল প্রতি কে.জি তিন টাকা দরে রেশন দোকানের মাধ্যমে পাবেন ।

৩) ''অন্নপূর্ণা'' প্রকল্প আওতা ভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি মাথা পিছু প্রতি মাসে বিনা মূল্যে দশ কেজি চাউল রেশন দোকানের মাধ্যমে পাবেন ।

৪) আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে বসবাসকারী যে কোন রেশন কার্ড ধারী পরিবার মাথা পিছু এক কেজি চিনি প্রতি মাসে তের টাকা পঞ্চাশ পয়সা দরে পাবেন এবং উপরোক্ত এলাকা ব্যতীত রাজ্যের সর্বত্র মাথা পিছু সাত শত গ্রাম চিনি প্রতিমাসে তের টাকা পঞ্চাশ পয়সা দরে রেশন দোকানের মাধ্যমে পাবেন ।

৫) রাজ্যের যে কোন রেশন কার্ডধারী পরিবারগুলো মাথা পিছু এক লিটার কেরোসিন তৈল রেশন দোকানের মাধ্যমে পাবেন ।

৬) রেশন কার্ড ধারী এ.পি.এল ভূক্ত পরিবারগুলো পরিবার পিছু পঁয়ত্রিশ কেজি চাউল রেশন দোকানের মাধ্যমে পাবেন।

১৫ই মার্চ ২০০৬ সালে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গোপাল দাস মহাশয়ের

ভাষণ

অন্যান্য বারের মতো এবারো সারা বিশ্বের সাথে আমাদের এই রাজ্যেও ১৫ই মার্চ দিনটি বিশ্বভোক্তা অধিকার দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে । সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন ক্রেতা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছা সেবী সংগঠনের উদ্যোগে সেমিনার , আলোচনাচক্র ও বিভিন্ন কার্য্যাবলীর মাধ্যমে এই দিবসটি সর্বত্র পালিত হয়ে থাকে । ক্রেতা বা ভোক্তা সাধারনকে তাদের স্বার্থ তথা অধিকার সর্ম্পকে সচেতন করে তোলা এবং এর মাধ্যমে ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনকে আরো জোরদার ও শক্তিশালী করে তোলাই হচ্ছে এ দিবসের লক্ষ্য ও তাৎপর্য । অর্থনৈতিক ও সামজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সমাজের দূর্বলতর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় এবং ভোক্তা হিসাবে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। বর্তমান মুক্ত বাজার ও বিশ্বায়নের যুগে একজন দায়িত্বশীল ও নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ক্রেতাই হচ্ছেন সুরক্ষিত ক্রেতা যিনি এই ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনকে বৃহত্তর স্বার্থে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন ।

আমাদের দেশের ভোক্তারা বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়ে থাকেন । যেমন পণ্যের ওজনে, গুনগতমানে, মূল্যে এবং প্রতিশ্রুতি মত পণ্য ও পরিষেব না পেয়ে । আমাদের দেশে অশিক্ষিতভোক্তারা যেমন প্রতিনিয়ত প্রতারিত হন তেমনি সার্বিক সচেতনতার অভাবে শিক্ষিত ভোক্তারাও সমান ভাবে প্রতারিত হন। কাজেই ভোক্তা স্বার্থ ও এর সংরক্ষন বিষয়ে ভোক্তাদের শিক্ষিত করে তোলা যেমন দরকার, তেমনি দরকার ভোক্তা স্বার্থ বিষয়ে সময়োপযোগী সচেতনতা ।

বস্তুত পক্ষে ভোক্তা শব্দটির সাথে আধুনিক জীবন ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে আমাদের চারপাশে আজ বিচিত্র পণ্যভাণ্ডার ও বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার আয়োজন। অপরপক্ষে ভোক্তাগণকে নানাভাবে বঞ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল নেওয়া হচ্ছে । তাই ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন । ন্যায্যদামে . সঠিক ওজন ও নির্দিষ্ট গুনমানের দ্রব্যাদি এবং যথাযথ পরিষেবা পাওয়া ভোক্তাদের আইনগত অধিকারের অঙ্গ । আমার মনে হয় অধিকার সুরক্ষার বিষয়টির সাথে সচেতনতা শব্দটি ওতোপ্রাতভাবে জড়িয়ে আছে । শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে কারও অধিকার সুরক্ষিত করা সম্ভব নয় । তাই একথা আমি স্পষ্ট করে বলতে

চাই যে, ভোক্তা সাধারন সচেতন না হলে তাদের অধিকার সুরক্ষা করা নিঃসন্দেহে কষ্ট সাধ্য । ভোক্তা সাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে রাজ্য সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহন করেছে । কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন ব্যতীত কোন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না । তাই ভোক্তা অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীতে জনগণের সক্রিয় সহযোগীতা ও অংশগ্রহন একান্তভাবে কামনা করছি ।

এ বছর কেন্দ্রীয় সরকার ভোক্তা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টিকে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালনের মূল বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভোক্তা সুরক্ষা আইনের পরিধি ব্যাপক। স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা, ওজন ও পরিমাপ, দ্রব্যের গুণমান এবং বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা ভোক্তা আইনের অন্তর্ভূক্ত। পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, জীবনবীমা, চিকিৎসা, খাদ্যে ভেজাল, ব্যাংক ও ডাক পরিষেবা, পরিবহন, টেলিফোন ইত্যাদি সহ অনেক বিষয়ই ভোক্তা আইনের অধীন। তবে এক্ষেত্রে ভোক্তা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোটা ভোক্তা সমাজ আজ ক্রমবর্ধমান ভোগবাদ, বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ এবং বাজার অর্থনীতির মত পরিস্থিতির সম্মুখীন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার ভোক্তা কল্যাণের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষা আইনটি যথাযথ ভাবে রূপায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে রাজ্য সরকার ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্যে এবং ভোক্তাদের সচেতনতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভেজাল খাদ্য নিরোধক আইনটিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করার জন্যে বিরামহীন প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল, ঔষধপত্রে ভেজাল ইত্যাদির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং ভোক্তাদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার জন্যে দ্রব্যের গুনমান সম্পর্কে আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইন যথাযথ ভাবে এ রাজ্যে প্রয়োগের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

এ উদ্দেশ্যে ভারতীয় মানক সংস্থার প্রতিনিধি সহ আমাদের রাজ্যে সরকারী পর্যায়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, ভোক্তা আদালতগুলোর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থার ও লক্ষ্যপূর্ণ গনবন্টন ব্যবস্থার সুফলগুলো আপামর জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সরকারের তরফ থেকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তৃণমূল স্তরে নির্বাচিত পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত ও পৌর সংস্থাকে যুক্ত করে প্রতিটি ন্যায্যমূল্যের দোকানের জন্য একটি করে তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মহকুমা স্তরে নির্বাচিত বিধায়কগণকে সভাপতি করে মহকুমা ভিত্তিক সরবরাহ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সমস্ত কমিটিগুলোকে ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা দেওয়া

হয়েছে। প্রতিটি ন্যায্যমূল্যের দোকানে একটি করে অভিযোগ ও তদন্ত বহি দেওয়া হয়েছে যাতে ভোক্তাগণ তাদের অভিযোগ এই বহিতে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। তাছাড়া, ভোক্তা আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য দপ্তর ইতিমধ্যেই ভোক্তা কল্যাণ তহবিল গঠন করেছে। ভোক্তা কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়িত করার জন্য এবং ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সকল সংগঠনগুলোর সাথে দপ্তর নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে এবং তাদের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে মাঝে মাঝে ভোক্তা আইন ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দপ্তর থেকে ভোক্তা স্বার্থ নামে একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন বের করা হচ্ছে। এই পত্রিকাগুলো বিনামূল্যে রাজ্যের সর্বত্র সরকারী পাঠাগার, তথ্য কেন্দ্র সহ জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, পৌরসভা, নগর পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। রাজ্যের ২৭টি মাধ্যমিক / উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোক্তা সংঘ গঠন করা হয়েছে। আরও ৩১টি এরকম বিদ্যালয়ে ভোক্তা সংঘ গঠন করার প্রক্রিয়া চলছে। এগুলোর কাজ হচ্ছে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্র প্রদর্শণী, বিতর্ক প্রতিযোগীতা ইত্যাদির মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সাথে দপ্তর যৌথ ভাবে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমানে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়টি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত আইন সচেতনতা শিবিরগুলোতে আলোচিত হচ্ছে।

আমি এখানে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি যে রাজ্যের ভোক্তা আদালতগুলোর পরিকাঠামোগত ঘাটতি আমরা যথাসম্ভব পূরণ করেছি। রাজ্যের ভোক্তা আদালতগুলোতে ইন্টারনেট সুবিধা সহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে। ভোক্তা হিসাবে জনগণের অধিকার সমূহ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা আদালতগুলো অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে কাজ করছে। ভোক্তা আদালতগুলোতে কোন আইনজীবির সাহায্যের দরকার হয় না। সাদা কাগজে অভিযোগ পত্র দায়ের করা যায় এবং নিজের মামলা নিজেই পরিচালনা করা যায়। এ সম্পর্কে জনগণকে অবগত হতে হবে এবং সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। একই ভাবে সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে জনগণকে আরও বেশী যত্নবান ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হতে হবে। পানীয় জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদির অপচয় রোধে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং ভোক্তা হিসাবে তাদেরকে যথাযথ দায়িত্বশীল হতে হবে।

ক্রেতা স্বার্থ সচেতনতা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে বিশেষ করে দুর্বলতর শ্রেণীর কাছে ভোক্তা অধিকার বিষয় সমূহকে পৌঁছে দিতে আমাদের আরও বেশী উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে রাজ্যের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সহ সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সময়ে আর্থ সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। অবশ্য পরিবর্তনশীলতাই

জীবনের ধর্ম। মানব সমাজের ইতিহাস এই পরিবর্ত নশীলতারই স্বাক্ষ্য বহন করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এবং অন্যান্য আর্থ সামাজিক কারণে এই পরিবর্তনশীলতার রূপ ও ধরণ পাল্টেছে। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গোটা সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভোক্তা স্বার্থ বিষয়টিকে আলাদা ভাবে বিচার করা নিশ্চয়ই সঠিক হবে না। তাই ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে গেলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের নীতি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, ভোক্তা আন্দোলনে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আমাদের নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সঠিক নিশানা দেখাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আসলে আপনার স্বার্থ সুরক্ষার দায়িত্ব আপনার হাতেই। এই সচেতনতা বোধই আপনাকে বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

আপনাকে মনে রাখতে হবে ভোক্তা হিসাবে আপনার কিছু আইনগত অধিকার আছে। সে অধিকারগুলো যাতে সুরক্ষিত থাকে সেদিক থেকে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যে জিনিস কিনছেন তার গুণমান, পরিমান ও দাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার বা যাচাই করার অধিকার আপনার আছে। যে কোন পরিষেবা সম্পর্কেও এটা সত্য। পণ্য ও পরিষেবা সম্পর্কে আপনার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর অধিকার আপনার আছে। সংশ্লিষ্ট দ্রব্য কিংবা পরিষেবা সম্পর্কে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আপনার পছন্দমত দ্রব্য ক্রয় করা কিংবা পরিষেবা ভোগ করার অধিকার আপনার আছে। বাছাই করে প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্য ও পরিষেবা কেনার অধিকারও আপনার আছে।

আমি আগেই বলেছি অধিকার ভোগ করতে গেলে আপনাকে সচেতন হতে হবে। তাছাড়া আপনাকে দায়িত্বশীল হতে হবে। পরিষেবার ক্ষেত্রেও আপনাকে এ বিষয়গুলোর সর্ম্পকে সচেতন হতে হবে। চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন যাতে আপনাকে প্রলোভিত না করতে পারে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপরও বঞ্চিত হলে ভোক্তা আদালতের দ্বারস্থ হতে দ্বিধা বোধ করবেন না। সবশেষে ভোক্তা আন্দোলন কে আরও শক্তিশালী করার জন্যে আমি আপনাদের সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি এবং এই আন্দোলনকে আরও গতিশীল করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান রাখছি। আসুন সবাই মিলে এই ভোক্তা স্বার্থ আন্দোলনকে আরও প্রানবন্ত ও গতিশীল করে তুলি এবং আজকের এই মহতী বিশ্ব ভোক্তা স্বার্থ দিবসের তাৎপর্য্যকে পূর্নাঙ্গভাবে সফল করে তুলতে উদ্যোগী হই।

নমস্কার -

গোপাল দাস

মাননীয় মন্ত্রী

খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর।

ভোক্তা আদালতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায় ঃ-

১) শ্রীমতি মিনতি বিশ্বাস তার প্রগতি রোডস্থিত ভাড়া বাড়ি থেকে তার নামীয় টেলিফোন সংযোগটি তার রামনগর ১নং রাস্তায় অবস্থিত নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরের জন্য ভারত সঞ্চার নিগম এর এস.ডি.ই (কমার্শিয়াল) এর নিকট ২৪.১১.২০০৩ ইং তারিখে আবেদন করা সত্বেও বি.এস.এন.এল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ ৭ মাস তালবাহানার পর ১৪.০৬.২০০৪ ইং তারিখে টেলিফোন সংযোগটি তার নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত করে । ফলে শ্রীমতি বিশ্বাস এই দীর্ঘ সাত মাস সময় টেলিফোনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভোক্তা আদালতে বি.এস.এন.এল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২,০০,০০০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরন দাবী করে একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন ।

আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ভারতীয় সঞ্চার নিগমের আগরতলাস্থিত অফিসে জেনারেল ম্যানেজারকে এই নিগমের পক্ষে শ্রীমতি মিনতি বিশ্বাস কে ক্ষতিপূরন বাবদ ১০,০০০ টাকা এবং মামলা পরিচালনার খরচ বাবদ অতিরিক্ত ১,০০০টাকা মামলা নথিভূক্ত করনের দিন থেকে বার্ষিক ৬% সুদ সহ ১ মাস সময়ের মধ্যে প্রদান করার নির্দেশ দেন । নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা না দিলে বার্ষিক ৮% সুদ যুক্ত হবে বলে আদালতের নির্দেশে বলা হয় ।

২) আগরতলা পূর্বপ্রতাপগড় নিবাসী শ্রী দিলীপ কুমার দাস, আগরতলা টি.আর.টি.সির রেলওয়ে টিকিট বুকিং কাউন্টারে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চেন্নাই যাওয়ার জন্য তৎকাল সেবা স্কীমে হাওড়া মাদ্রাজ মেইলে তার স্ত্রী , শ্যালক এবং নিজের নামে টিকিট কিনতে গেলে বুকিং ক্লার্ক তিনজনের নামে একটি টিকিট নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে শ্রী দাসকে প্রদান করেন । কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে শ্রী দাস সহ উক্ত দুইজন হাওড়া স্টেশনে তাদের জন্য বরাদ্দ কৃত ট্রেনের আসন গ্রহন করে যাত্রা শুরু করলে কর্তব্যরত টি.টি. উক্ত টিকিট চেকিং এর সময় জানান যে, উনার শ্যালক উনার পরিবারের সদস্য নয় বলে তার একই টিকিটে শ্রী দাসের সঙ্গে ভ্রমন করা রেলওয়ে আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে এবং সে জন্য তিনি শ্রী দাসকে জরিমানা দিতে এবং তার শ্যালকের জন্য নতুন করে টিকিটের মূল্য দিতে বাধ্য করেন । এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী দাস ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরন দাবী করে টি.আর.টি.সি এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভোক্তা আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করেন । আদালত তার রায়ে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজারকে আবেদনকারী কর্তৃক তার শ্যালকের জন্য ক্রয় করা অব্যবহৃত তৎকাল টিকিটের মূল্য এবং প্রদত্ত জরিমানার টাকা ১ মাস সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে ফেরৎ দিতে নির্দেশ দেন । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ৮% সুদ যুক্ত হবে বলেও আদালতের এই নির্দেশে বলা হয়।

৩)	আগরতলা শান্তি পাড়া নিবাসী শ্রীমতি তন্দ্রা ঘোষ , ও শ্রীমতি অন্তরা ঘোষ উভয়েই ১০.০৪.২০০৪ ইং তারিখে পরিশোধ যোগ্য এরকম পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের ১০ টি করে কিষান বিকাশ পত্র আগরতলা হেড পোষ্ট অফিস থেকে ১০.১০.১৯৯৪ ইং তারিখে ক্রয় করেন । দূভার্গ্যবিশতঃ উভয়েই তাদের সার্টিফিকেট গুলো ১৭.০৯.১৯৯৯ ইং তারিখে হারিয়ে ফেলেন এবং ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য যথাসময়ে বিধিসন্মতভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন । কিন্তু ডাক বিভাগ ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট প্রদানে অযথা বিলম্ব করেন এবং ১১.০৩.২০০৩ ইং তারিখে সুদ ছাড়া সার্টিফিকেট গুলোর মেয়াদ উর্ত্তীন কালের মূল্য পরিশোধ করেন । ফলে উভয়ে উক্ত সার্টিফিকেট গুলোর মেয়াদ উর্ত্তীন হওয়ার দিন থেকে পরিশোধিত হওয়ার দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ, ক্ষতিপূরন এবং খরচ দাবী করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভোক্তা আদালতের শরনাপন্ন হন । আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ডাকঘর কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীদের প্রত্যেককে পরিশোধযোগ্য ১ লক্ষ টাকার উপর ১০.০৪.২০০০ ইং তারিখ থেকে ১৩.০৩.২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৮% সুদ , ক্ষতিপূরন বাবদ ১,০০০ টাকা এবং খরচ বাবদ ৫০০ টাকা ৩০দিন সময়ের মধ্যে প্রদান করার নির্দেশ দেয় ।

৪)	আগরতলার রানীরাজার নিবাসী শ্রী অপূর্ব পোদ্দার তার মায়ের বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার জন্য আগরতলা - কোলকাতা এবং কোলকাতা- আগরতলার রির্টান জার্নি সম্বলিত বিমানের টিকিট ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ক্রয় করেন । কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে আগরতলা এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং এর সময় কর্তব্যরত ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কর্মচারীরা ভুল করে রির্টান জার্নির কুপনটি টিকিট থেকে ছিঁড়ে ফেলে মূল টিকিট টি তার মায়ের কাছে হস্তান্তর করেন । শ্রী পোদ্দারের মা ক্যান্সারের রোগী ছিলেন এবং চিকিৎসা শেষে আগরতলা ফেরার জন্য দমদম বিমান বন্দরে রিপোর্টিং এর জন্য গেলে কর্তব্যরত কর্মচারীরা টিকিটে রির্টান জার্নি কুপন টি না থাকাতে উনার মাকে নির্দিষ্ট বিমানে আগরতলা আসতে দেন নি । ফলে উনার অসুস্থ মা অতিরিক্ত ১০ দিন কোলকাতা থেকে নতুন করে টিকিট কেটে আগরতলায় আসতে বাধ্য হন । এই পরিস্থিতিতে শ্রী পোদ্দার পরিষেবা ঘাটতির জন্য ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নিকট ৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরন দাবী করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভোক্তা আদালতে একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন । আদালত তার রায়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষকে টিকিটের মূল্য বাবদ ১৪৩০ টাকা , ক্ষতিপূরন বাবদ ১০,০০০ টাকা এবং খরচ বাবদ ১,০০০ টাকা আবেদনকারীকে তিরিশ দিন সময়ের মধ্যে প্রদান করার নির্দেশ দেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা প্রদান না করা হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ৬% হারে সুদ যুক্ত হবে বলেও আদালতের এই নির্দেশে বলা হয় ।

১৫ই মার্চ ২০০৬ সালে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে
আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রীযুক্ত সমরজিৎ ভৌমিক মহাশয়ের ভাষণ।

প্রিয় ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনেরা,

১৫ই মার্চ ২০০৬ইং দিনটি সারা দেশের সাথে আমাদের এই ক্ষুদ্র বনানী রাজ্যে ও বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস হিসাবে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে পালিত হচ্ছে। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এবং খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নে ভোক্তা সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬ একটি চমৎকার আইন যেখানে অতি সহজে দ্রুত ভোক্তাগণকে ভোক্তা আদালতের মাধ্যমে সুবিচার দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। অন্যান্য ভোক্তা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন সমূহ যা এযাবৎ প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে শাস্তিমূলক কিন্তু ভোক্তা সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬ হচ্ছে ক্ষতিপূরণমূলক। ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ সংশোধনী আইন ২০০২ অনুসারে ভোক্তা আদালতগুলোর আর্থিক পরিধি এ রকম -- দ্রব্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকার ফলে কোন ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্থ হলে এবং সেই ক্ষতিপূরণের দাবী ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে জেলা ভোক্তা আদালতে, ২০ লক্ষ টাকার বেশী এবং ১ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে রাজ্য ভোক্তা আদালতে এবং ১ কোটি টাকার বেশী হলে তিনি জাতীয় ভোক্তা আদালতে মামলা দায়ের করবেন। ভোক্তা আইন অনুসারে ভোক্তা হচ্ছেন তিনি, যিনি অর্থের বিনিময়ে কোন দ্রব্য ক্রয় করেন অথবা কোন পরিষেবা নিজ প্রয়োজনে গ্রহণ করেন। সহজ সরল ভাষায় বলা যায় যে, ভোক্তা সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬ এর মূল উদ্দেশ্য হল ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা। এই আইনে প্রদত্ত ভোক্তা অধিকারগুলো হলঃ- (১) দ্রব্য ও সেবা নিরাপত্তার অধিকার, (২) তথ্য পাওয়ার অধিকার, (৩) পছন্দ করার অধিকার, (৪) বক্তব্য শোনানোর অধিকার, (৫) সুবিচার পাওয়ার অধিকার এবং (৬) ভোক্তা শিক্ষা পাওয়ার অধিকার।

ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতাই তাদের প্রকৃত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য বাজারজাত করা হলে সচেতন ভোক্তাগণ তা সরকারের গোচরে আনতে পারেন। উক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্থ হলে সংশ্লিষ্ট ভোক্তা অতি সহজে ভোক্তা আদালত থেকে সুবিচার পেতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ভেজালযুক্ত খাদ্য দ্রব্য যেমন জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তেমনি নিম্ন মান সম্পন্ন সিমেন্ট ইত্যাদি পণ্য জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক। এই ব্যাপারে আপনাদের সকলকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

এখন ভোক্তা সংরক্ষণ আইনের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে দু একটি কথা বলছি ঃ--

* অর্থের বিনিময়ে কোন দ্রব্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে কিংবা কোন পরিষেবা ভোগ করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হলে ক্ষতিগ্রস্থ ভোক্তা ভোক্তা আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

* ভোক্তা আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে কোন আইনজীবির সহায়তার প্রয়োজন হয় না।

* ভোক্তা আইন অনুসারে আমাদের দেশে ত্রিস্তরীয় ভোক্তা আদালত চালু আছে। এগুলো হল -- (ক) জাতীয় ভোক্তা আদালত (খ) রাজ্য ভোক্তা আদালত এবং (গ) জেলা ভোক্তা আদালত।

* ভোক্তা আদালতগুলো ক্রটিপূর্ণ দ্রব্য সারাই করে দেওয়া, ফেরত নিয়ে পাল্টিয়ে দেওয়া, আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া ইত্যাদির আদেশ দিয়ে থাকেন।

* ভোক্তা আদালতগুলোর বিচার পদ্ধতি অতি সহজ ও সরল এবং একজন ভোক্তা নিজেই নিজের মামলা চালাতে পারেন।

* এই আইনে ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্রীয়স্তরে ও রাজ্যস্তরে ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষা পরিষদ গঠনের সংস্থান রাখা হয়েছে।

* এই আইনের ২০০২ সালের সংশোধনী অনুসারে জেলা ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদ গঠনের সংস্থান রাখা হয়েছে।

* এই আইনের ২০০২ সালের সংশোধনীতে ভোক্তা আদালতগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

* ক্ষতিগ্রস্থ ও বঞ্চিত ভোক্তাগণকে সাময়িক সুবিধা দানের জন্য এই আইনে মামলা চলাকালীন সময়ে অর্ন্তবর্তীকালীন রায় দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে।

* কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা রাজ্য সরকার কর্তৃক বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ ভোক্তাদের পক্ষে ভোক্তা আদালতে মামলা দায়ের করার সংস্থান রাখা হয়েছে।

* অভিযোগকারীগণ যাতে আরও দ্রুত সুবিচার পেতে পারেন তার জন্যে এই আইনের ২০০২ সালের সংশোধনীতে মামলা নিষ্পত্তি করার সময় সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

* ভোক্তা আদালতগুলোর আদেশ যাতে যথাযথভাবে কার্যকর করা যায় সেজন্য ভোক্তা আদালতগুলোকে প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ভোক্তা আদালতে দায়ের করা অভিযোগ পত্রে আপনাকে যে সব বিষয় উল্লেখ করতে হবে সেগুলি বলছি -- (ক) অভিযোগকারীর পুরো নাম ও ঠিকানা, (খ) অভিযুক্ত পক্ষের পুরো নাম ও ঠিকানা, (গ) অভিযোগের কারণ ও বিষয়বস্তু, (ঘ) দ্রব্য ক্রয় অথবা পরিষেবা প্রদানের তারিখ, (ঙ) দ্রাব্যের নাম ও পরিমান, (চ) যে ধরণের পরিষেবা গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ, (ছ) বিনিময় মূল্য, (জ) বিল, ভাউচার ইত্যাদির প্রতিলিপি এবং (ঝ) কি ধরণের ক্ষতিপূরণ দাবী করেন তার বিবরণ।

আপনারা নিশ্চই অবগত আছেন যে, ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষা করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ভোক্তা আদালতগুলো। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ভোক্তা আদালতগুলোর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ জেলার ভোক্তা আদালতের জন্যে উদয়পুরে এবং উত্তর জেলার ভোক্তা আদালতের জন্যে কৈলাশহরে পাকা বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। রাজ্য ভোক্তা আদালত ও পশ্চিম জেলা ভোক্তা আদালতের জন্যে আগরতলাস্থিত গোর্খাবস্তিতে নতুন ভবন তৈরী করা হয়েছে, যদিও নানা প্রশাসনিক কারণে এই দুটি আদালত এখনও নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়নি। ধলাই জেলায় ভোক্তা আদালত গঠনের জন্যে সমস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সমাধা করা হয়েছে। এই সকল ভোক্তা আদালতগুলিতে ইন্টারনেট সুবিধা সহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে রাজ্য ভোক্তা আদালতগুলোতে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অধিকার করে আছে আর জেলা ভোক্তা আদালতগুলোতে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে। অপরদিকে, রাজ্য ভোক্তা আদালতে মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতের ৩৪টি অঙ্গ রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে অষ্টম স্থানে আছে এবং জেলা ভোক্তা আদালতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ১৮তম স্থানে আছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, স্বেচ্ছাসেবী ভোক্তা সংগঠনগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার উদ্দেশ্যে রাজ্যে ভোক্তা কল্যাণ তহবিল ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। আমরা যতটুকু জানি এই পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক রাজ্য সরকারই ভোক্তা কল্যাণ তহবিল গঠন করতে পেরেছে। আমরা তৃণমূল স্তরে ভোক্তা আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্যে এবং রাজ্যের সর্বত্র ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত আইন সচেতনতা শিবিরগুলোর আলোচ্যসূচীতে ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করেছি। আপনারা জেনে নিশ্চই আনন্দিত হবেন যে সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই এ ধরণের উদ্যোগ এই প্রথম নেওয়া হয়েছে যা ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা যায়। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিজ্ঞান উন্নত বিশ্বে ভোক্তাগণ নানভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। আজ আমাদের চারপাশে বিচিত্র পণ্যভাণ্ডার ও হরেক রকমের পরিষেবার আয়োজন। ভোক্তাদের প্রতারিত করার জন্যে নানা অপকৌশল

প্রতিনিয়তই নেওয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এ রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনে গণবন্টন ব্যবস্থা এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বস্তুতঃ পক্ষে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সকল অংশের মানুষই গণবন্টন ব্যবস্থা ও লক্ষ্যপূর্ণ গনবন্টন ব্যবস্থার সুবিধাগুলো ভোগ করছেন। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, গণবন্টন ব্যবস্থা / লক্ষ্যপূর্ণ গণবন্টন ব্যবস্থার অধীন সকল ভোক্তাগণ যাতে সঠিক মূল্যে নির্ধারিত পরিমাণ রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করার জন্যে আমরা ব্যাপক নজরদারীর ব্যবস্থা করেছি। প্রতিটি রেশনসপের জন্যে একটি করে তদারকি কমিটি গঠন করেছি। ন্যায্য মূল্যের দোকান ভিত্তিক এই তদারকি কমিটি সমূহকে নায্য মূল্যের দোকান পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ন্যায্য মূল্যের দোকানে একটি করে "**অভিযোগ ও তদন্ত বহিঃ**" দেওয়া হয়েছে যাতে ভোক্তাগণ তাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের জন্য প্রণীত নাগরিক সনদ ও যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে ব্যাপক অংশের জনগণ ভোক্তা হিসাবে তাদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন এবং তাদের অভিযোগের যথাযথ প্রতিকার পাওয়ার জন্য ভোক্তা আদালতে মামলা দায়ের করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাই, আজাকের দিনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ভোক্তাদের সচেতনাতা বৃদ্ধির জন্যে সংগঠিত ভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ভোক্তাগণ সচেতন হলে ব্যবসায়িক দুর্নীতি বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ভোক্তাদরদী বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমর্থন ও সহযোগীতা একান্ত জরুরী যাতে একটি ভোক্তা সহায়ক মৈত্রীপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা যায় এবং এই .উদ্যোগ নিশ্চিন্ত ভাবেই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরক হবে। সবশেষে আমি সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং দৃঢ় আশা ব্যক্ত করছি যে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ রাজ্যে ভোক্তা আন্দোলন আগামী দিনে আরও গতিশীল হবে।

নমস্কার

সমরজিৎ ভৌমিক
অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক অধিকার
ত্রিপুরা।

"স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্রেতা সংরক্ষণ আইনের ভূমিকা"

-- ডাঃ সুশান্ত সেন

আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজ

ক্রেতা বা ভোক্তা সংরক্ষণ আইন প্রণয়নে বর্তমান কালের এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে এই আইন আগেই চালু ছিল। আমাদের দেশে ১৯৮৬ ইং সালে এই আইনটি চালু হয়।

মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়ে বাঁচতে শুরু করে তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে শ্রম বিন্যাস করে নেয়। যারা যে কাজে বেশী দক্ষ বা যাদের পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব তারা সে কাজ করতে শুরু করেন। একজনের তৈরী সামগ্রী বা একজনের অর্জিত দক্ষতা বা জ্ঞান আরেকজনের প্রয়োজনে আসে। প্রথম দিকে বিনিময় মূল্য ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিনিময় মূল্য চালু হয়। তখনকার সহজ সরল জীবনে যেহেতু চাহিদা বেশী ছিল না, তাই গুনগত মান ও মূল্য নিয়ে কেউ ততটা সচেতন ছিলেন না। ধীরে ধীরে সমাজ যত আধুনিক হতে থাকে সামগ্রীর গুনগত মানও তত বৃদ্ধি পায় প্রতিযোগিতার কারণে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে বিনিময় মূল্য। ধীরে ধীরে সমগ্র ব্যবস্থাটি মুনাফা কেন্দ্রীক হয়ে যায়। ক্রেতা বা ভোক্তার ভূমিকা হয় নগণ্য। ধীরে ধীরে অসন্তোষ বাড়তে থাকায় রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়ে প্রণয়ন করে ক্রেতা বা ভোক্তা সংরক্ষণ আইন।

১৯৮৬ ইং সালে আমাদের দেশে ক্রেতা বা ভোক্তা সংরক্ষণ আইন চালু হয়। বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রথমাবস্থায় ছিল একটি সেবা যা সাধারণতঃ পরিচালিত হত মূলতঃ কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে। উনবিংশ শতাব্দীতে এটি রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন একটি দাতব্য ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিতি পায়। যেহেতু এই পরিষেবার কোন বিনিময় মূল্য ছিল না, তাই এর গুনগত মান নিয়ে দাতা বা গ্রহীতার কোন দায় বা সচেতনতাও ছিলনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বেসরকারী উদ্যোগ শুরু হয় এই ক্ষেত্রটিতে। প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকেন্দ্রীক বেসরকারী উদ্যোগে সেবার মনোভাবই ছিল বেশী। কিন্তু ধীরে ধীরে তা থেকে বেশী বেশী মুনাফা আদায়ের চেষ্টা শুরু হয়। সেবা পরিণত হয় পরিষেবায়। রোগী পরিণত হয় ভোক্তায়। চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত হয় ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে। সেবার মনোবৃত্তি অবলুপ্ত হওয়ায় ধীরে ধীরে আসে অবহেলা বা ঠকানোর চেষ্টা। চিরকালীন চিকিৎসক ও রোগীর মধুর ও আস্থার সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ বা অভিযোগ খন্ডনের পালা শুরু হয়। যার ফলে রাষ্ট্র বাধ্য হয় বেসরকারী চিকিৎসা পরিসেবাকে ক্রেতা সংরক্ষণ আইনের আওতায় আনতে।

এই আইন প্রণয়নের ফলে বিনিময় মূল্যের পরিবর্তে পাওয়া চিকিৎসা পরিষেবার অসন্তুষ্টির বিচার চাওয়া যায় ক্রেতা আদালতে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোক্তার অধিকার বা স্বার্থ সুনিশ্চিত করা ও ভোক্তার জানার অধিকার সুনিশ্চিত করে তাঁকে অনৈতিক ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তি দেয়া।

এই আইন চালু হওয়ায় পরিষেবাদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আরো সচেতন থাকবেন। কর্তব্যে অবহেলা কমবে। কিন্তু পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে পরবর্তী সময়ে আইনের চোখে কর্তব্যে অবহেলা বা ব্যর্থতার দায় এড়াতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো শুরু হতে পারে এবং হচ্ছেও। এই একটি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন দেশ জুড়ে এই আইনের বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র অনড় থাকায় তাঁরা এটা মানতে বাধ্য হন। এতে কারো পক্ষেই তেমন বড় মাপের কোন অসুবিধা হয়নি । তবে একটা কথা হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থাতে যেহেতু নিশ্চয়তার থেকে অনিশ্চয়তাই বেশী, তাই সবক্ষেত্রে বিনিময় মূল্যে পাওয়া পরিষেবা যে অব্যর্থ হবেনা সেই বিষয়টি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। তাছাড়া আমাদের মত দেশে যেখানে সিংহভাগই গরীব, তাঁদের পক্ষে এই আইনের ফলে সৃষ্ট ব্যয়বহুল পরীক্ষা বা চিকিৎসা চালানো সম্ভব কিনা সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। দেখা গেছে এই আইন চালু হবার পর চিকিৎসা ব্যয় অনেকগুণ বেড়ে গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থা নিতে ইতস্ততঃ হন অনেকেই। তাই জরুরী বা মুমূর্ষ রোগীর চিকিৎসা করতে রাজী হননা অনেক বেসরকারী চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। এতে তাঁদের দোষ দেয়া যায় না, অথচ রোগীও দূর্ভোগ পেয়ে থাকেন। আমেরিকায় শুধুমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত মামলায় ক্ষতিপূরণ দেবার ফলে বহু চিকিৎসক ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। আমেরিকার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে চিকিৎসা সংক্রান্ত মামলায় যত টাকা খরচ হয়, তার শতকরা আশিভাগই ব্যয় হয় আদালতের খরচা ও আইনজীবিদের পারিশ্রমিক হিসাবে। বিচারপ্রার্থী পান মাত্র কুড়ি শতাংশ। তাই প্রশ্ন আসে এই আইন তাহলে কাদের স্বার্থে প্রবর্তিত হয়েছে?

এই আইন চালু হবার ফলে ভোক্তা সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। যে কোন ব্যাপারে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া বন্ধ হয়েছে। চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানও আরো বেশী সচেতন থাকছেন। আগেই সম্মতি দেওয়ায় পরবর্তী সময়ে অভিযোগ করা বন্ধ হয়েছে। তবে চিকিৎসার ব্যয় বেড়ে গেছে বহুগুন। অনুমান নির্ভর চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যার ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অত্যাধুনিক পদ্ধতির চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতীর ব্যবসা বেড়েছে বহুগুন। চিকিৎসা বীমার ব্যবসাও চালু হয়েছে।

প্রশ্ন থাকছে সমগ্র ব্যবস্থাটি যাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তীত হচ্ছে, তিনি কতটা লাভবান হচ্ছেন। চিকিৎসার ব্যর্থতার শাস্তি যদি লক্ষ টাকার অংকের হয়, তাহলে চিকিৎসার সফলতাও কি অনুরূপ অংক দাবী করতে পারে না? এই বিপুল বোঝা বইবে কে? তাই আইনকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং ভোক্তা ও পরিষেবাদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সচেতন করেও মনে রাখতে হবে যে চিকিৎসক ও রোগীর চিরকালীন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। যত তাড়াতাড়ি এটা বাস্তবায়িত হয়, ততই মঙ্গল। এই ব্যাপারে সরকার, চিকিৎসকদের সংগঠন, সংবাদমধ্যম ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে।

রক্ত যাওয়ার বিরাম নেই

- নিধু ভূষন হাজরা

ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম.এস.সির রেজাল্ট আউট হয়েছে । অমিতা নিজেও ভাবতে পারেনি ফল ততটা ভাল হবে । লিষ্টে তার নামটা উপরের দিকেই রয়েছে । ভাবল এবার হয়ত একটা কিছু হয়েই যাবে । কলেজে পার্টটাইম বা স্কুলে ফিক্সড পে যা হোক একটা হয়ে যাবে । বছরে কয়েক আগে সে যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল তখন ক্যান্সারে বাপকে হারায় । ওর বাবা নির্মল তলাপাত্র পুলিশের মাঝারী ধরনের কর্মচারী ছিলেন । ডিপার্টমেন্ট অসহায় পরিবারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন অমিতাকে একটা ছোট খাট চাকরী দিতে । অমিতার মা তিনটি লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করা মেয়ের ভাগ্যকে এভাবে বিপন্ন হতে দেননি । সরকারী চাকরীর অফার ফিরিয়ে দেন । এখন কর্মচারীদের পরিবারের সেই সুযোগও অনেকটাই দূরে সরে গেছে ।

অমিতার রেজাল্ট দেখে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ী সকলেই খুশী । পাড়ার নেতৃত্ব দেবার মত নেতা আশীর্বাদ করে বললেন তোমার চাকরী হয়ে যাবে । সরকার এত গুলো স্কুল, কলেজ চালাবে কি করে চাকরী না হলে । বিষয় শিক্ষকের অভাবে ছাত্র আন্দোলন চলছে ।

কেমিস্ট্রিতে ভাল নম্বর পেয়ে ছিল অমিতা । দেড় মাস আগে অমিতার এক বান্ধবী একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরী পেয়ে গেছে । বিদ্যাভবন স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ খুলছে । এদের কেমেষ্ট্রির টীচার দরকার । অমিতা বিদ্যাভবেন চাকরী নিল পনেরশ টাকা বেতনের একটি মৌখিক কথা দেওয়া নেওয়া চুক্তির মাধ্যমে ।

আজই প্রথম মাসের বেতন নিয়ে অমিতা ফিরল বাড়ীতে । ঘরে এসে দেখে মা ও দিদন গল্প করছে। অমিতার মনটা খুব খারাপ । স্কুলের ক্যাশিয়ার ১৩০০ টাকা হাতে দিলে অমিতা দুশ টাকা কম কেন জানতে চাইলে শুনলো স্কুল বাসে আসা যাওয়ার জন্য দুশ টাকা কেটে রাখা হয়েছে ।

নাতনীর মন খারাপ দেখে দিদন বললে কিরে মন খারাপ করে বসে রয়েছিস কেন ? না কিছুই নয়, দিদন তুমি যে ছোটবেলা আমাকে রূপকথার গল্প শুনাতে মনে আছে ?
- আছে । শুনবি ! শুনবো । তাহলে শুন -

পাহাড়ি রাজ্য অরুনাচল । অরুনাচলে বাস করে আদি নামে এক পাহাড়ি জাতি । সেই জাতির দুটো ছেলে একদিন কাটারি নিয়ে বনে ঢুকে গেল । বনের মধ্যে বাস করে শিকিপাবো নামে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য। মাথায় বড়ো দুটো সিং। ছেলে দুটি শিকিপাবোকে দেখে ভয়ে কাঠ। চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওদের ভয় পেতে দেখে শিকিপাবো বলল, ভয় কী বাছারা । ভয় পেও না । কাছে এসো । আমার ঝুড়িতে পাকা কলা আছে । খাও ।

ছেলে দুটির খিদেও পেয়েছিল । তারা ভয়ে ভয়ে দৈত্যের কাছে গিয়ে ঝুড়ি থেকে কলা নিয়ে খেতে লাগল । শিকিপাবো বলল, আমার বাড়ীতে চলো । সেখানে আরও ভালো ভালো জিনিস খেতে দেব । ছেলেদের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না । কিন্তু দৈত্যের ভয়ে তার পিছু পিছু তার বাড়িতে গেল । বনের মধ্যে দৈত্যের বাড়ী । দৈত্য বাড়িতে ঢুকে বউকে ডাকল, ও বউ শিগ্‌গির এসো । দ্যাখো কী এনেছি তোমার জন্যে।

শিকিপাবোর বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল । বিশাল তার চেহেরা । একেবারে তাড়কা রাক্ষসী । ছেলে দুটিকে দেখে দৈত্য বউয়ের জিভ দিয়ে জল পড়ে । আহা ! কী নধর দেহ । এদের মাংস খেতে কী ভালোই না লাগবে ।

দৈত্য বলল, তুমি এদের পাশের ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও । ভোর হলে অন্য সব ব্যবস্থা হবে । দৈত্য-বউ ছেলে দুটোর শোবার ব্যবস্থা করে দিল । ছেলে দুটো ঘুমলো না । চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ তারা শুনতে পেল দৈত্যের বউয়ের গলা । সে দৈত্যকে বলছে , আজকেই তো ছেলে দুটোকে কেটেকুটে খেলে ভালো হত ।

দৈত্য বলল, আজ থাক । কাল সকালে এদের মাংস দিয়ে জল খাবারটা তোফা হবে । এখন ঘুমাও । এই কথা শুনে ছেলে দুটোর তো প্রান খাঁচাছড়া । কিন্তু তারা সাহস হারায়নি । কিছুক্ষন পরে তারা শুনল , দৈত্য আর তার গিন্নির নাক ডাকছে । বাপরে বাপ । সে কী নাকের গর্জন । মনে হচ্ছে মেঘ ডাকছে । তারা ভাবল এই সুযোগ । দরজা খুলে তারা বাইরে বেরিয়ে দে ছুট ।

বনের মধ্যে তারা পথ খুঁজে পেল না । এদিক -ওদিক ঘুরপাক খেতে লাগল । এদিকে ভোর হলে শিকিপাবো দরজা খুলে ছেলে দুটিকে না দেখতে পেয়ে রেগে আগুন । সে তাদের পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে দেখল , একটা গাছের তলায় এসে পায়ের ছাপ মিলিয়ে গেছে । উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, ছেলে দুটি গাছের উপর বসে আছে । সে চেঁচিয়ে বলল, এই ছোড়ারা, শিগ্‌গির নেমে আয় । তোদের ঘার মটকে রক্ত খাবো । ছেলে দুটি ভয় পেয়ে পবন দেবতাকে ডাকতে লাগল- হে পবন দেবতা , রক্ষা করো । এমন ঝড়বৃষ্টি দাও যে দৈত্যটা ছিটকে যায় ।

পবন দেবতা তাদের কথা শুনলেন । তিনি এমন ঝড় দিলেন যে দৈত্যটা দূড়ে ছিটকে পড়ল। ছেলে দুটি সেই সুযোগে গাছ থেকে নেমে দৌড় । দৌড়াতে দৌড়াতে দেখল, কাঠবিড়ালিরা নদীর উপর কাঠ দিয়ে সাঁকো তৈরী করছে ।

ছেলে দুটি বলল , কাঠবিড়ালি ভাই আমাদের বাঁচাও দৈত্য এলে তোমরা ভুল পথ দেখিয়ে দিও । কাঁঠবিড়ালী বলল তোমরা পালাও । আমরা দৈত্যকে জব্দ করব ।

ছেলে দুটি বনের অন্য একটা পথ ধরে ছুটল । কিছুক্ষন পরে দৈত্য এসে কাঠবিড়ালিদের বলল, এ্যাই ছোঁড়া দুটো কোন পথ দিয়ে গেছে জানিস্ ?

কাঠ বিড়ালীরা বলল, ওরা তো সাঁকোর উপর দিয়ে নদীর ওপারে গেছে ।

দৈত্য বলল তাই নাকি ? দেখাচ্ছি মজা । এই বলে সে সাঁকোর উপর উঠল । দৈত্যের ভারে সাঁকোর কাঠ মড়াৎ করে ভেঙ্গে পড়ল । দৈত্য পড়ে গেল নদীর জলে । সে সাঁতার জানে না । হাবুডুবু খেতে খেতে এক সময় মরেই গেল । এদিকে শিকিপাবো বাড়ি না ফেরায় তার বউ খুব চিন্তায় পড়ে গেল। সে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয় সেই ভাঙ্গা সাঁকুর কাছে আর কাঠবিড়ালীদের কাছে জানল তার স্বামী সাঁকু ভেঙ্গে পড়ে মারা গেছে।

শিকিপাবোর বউ এবার নদীতে নেমে জলের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পেল স্বামীর মৃতদেহ । মৃতদেহের মাংস খসে কংকাল বেড়িয়ে পড়েছিল ।

শিকিপাবোর বউ সেই কংকালটা বয়ে বাড়ীতে নিয়ে এল । রোদে শুকিয়ে পাথর দিয়ে গুড়ো করল। তারপর সেই গুড়ো ভরল একটা রুপোর ঘড়ায়, আর একটা সোনার ঘড়ায় ।

শিকিপাবো মানুষের রক্ত খেতে খুব ভালোবসত । তাই তার বউ রুপোর ঘড়ার হাড়ের গুঁড়ো নদীতে ঢেলে দিয়ে বলল, জোঁক হও, মশা হও, মানুষের রক্ত খাও ।

সোনার ঘড়ার হাড়ের গুঁড়ো মানুষের বস্তির মধ্যে ঢেলে দিয়ে বলল, ছারপোকা হও । মানুষের রক্ত খাও । সেই থেকে শিকিপাবো জোঁক, মশা আর ছারপোকা হয়ে মানুসের রক্ত খেয়ে চলেছে । এই রক্ত খাওয়ার আর বিরাম নেই ।

গল্প শেষ হবার আগেই অমিতার চোখ ক্লান্তিতে তন্দ্রায় জড়িয়ে গেছে । সে যেন অনেক দিন আগের ফ্রকপরা দিদনের আঁচলে মুখ লুকানো ছোট্ট একটি মেয়ে । দিদন বলল- কিরে ঘুমিয়ে পড়লি ? অমিতার মা বলল- না মা একটু ঘুমিয়ে নিক । সারাদিন টিউশনি চলে । একটু পরেই কলেজের মেয়েরা আসবে ।

স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভোক্তাস্বার্থ নিয়ে নিয়মিত আলোচনাসভা করতে হবে

— দেবব্রত রায়

লেখার শুরুতেই পাঠকদের সবিনয়ে বলতে চাই যে, আমাদের ছোট্ট অথচ রাজনৈতিকভাবে সচেতন রাজ্য ত্রিপুরাতে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভোক্তাস্বার্থ নিয়ে সচেতনতা এখনো আশানুরূপভাবে গড়ে উঠেনি । বলা চলে নব্বই শতাংশ ছেলেমেয়ে এখনো এই গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি নিয়ে একেবারেই সচেতন নয় । অথচ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষন বিষয়টি এমনই একটি অস্ত্র যার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে খুব দ্রুত আমরা অর্থনৈতিক ভাবে এবং সামাজিকভাবে সচেতন করে তুলতে পারি। কাজটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । কাজটি কিছু কঠিন হলেও অসম্ভব বা অবাস্তব নয় । প্রয়োজন আরো একটু দায়বদ্ধতা, আরো একটু আন্তরিকতা । এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেমন অগ্রনী ভূমিকা নিতে হবে, তেমনি বিভিন্ন এন.জি.ও. দেরকে আন্তরিক ভাবে এগিয়ে আসতে হবে ।

উদাহরনস্বরূপ আমরা বলতে পারি, এন.এস.এস ওপেন এন.এস.এস, আইনী সচেতনতা কেন্দ্র, ত্রিপুরা গর্ণিত পরিষদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদ, ট্রাফিক দপ্তর, রাজ্য মহিলা কমিশন, সমাজ কল্যান পর্ষদ ইত্যাদি নানারকম সংস্থা বিদ্যালয় বা স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা সভা ইত্যাদি সংগঠিত করে যাচ্ছেন। এই সমস্ত আলোচনাগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট মন দিয়ে শুনে এবং হৃদয়ঙ্গম করে । যেমন আইনী সচেতনতা কেন্দ্র মেয়েদের সাংবিধানিক এবং আইনগত অধিকার নিয়ে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে নিয়মিত আলোচনা করছেন তা অত্যন্ত ফলপ্রসু হচ্ছে । ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স অনুযায়ী তাদের মতন করে যদি বক্তারা বিষয়গুলি আলোচনা করেন তাহলে সত্যিই তা দারুন প্রভাব ফেলতে পারে ।

যে কোন স্কুল , কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রকম আলোচনা সভা করতে খুব বেশি হলে পাঁচশো টাকা খরচ হতে পারে । দপ্তর নিয়ম করে মাসে যদি দুটি আলোচনা সভা করেন ভোক্তাস্বার্থ নিয়ে তাহলে মাত্র এক হাজার টাকা খরচ হতে পারে । ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষন আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকেই বক্তা হিসেবে-নিয়োগ করা যেতে পারে । তারা নিশ্চয়ই হাসিমুখে এই দায়িত্ব পালন করবেন । প্রতিটি আলোচনা সভাতে বিদ্যালয় বা কলেজের একজন শিক্ষককে আলোচক হিসেবে নেয়া যেতে পারে । দপ্তরের একটা চিঠি পেলেই যে কোন বিদ্যালয় এই ধরনের আলোচনা সভা করতে পারে । এক্ষেত্রে একটি মাইক্রোফোন এবং একটি ব্যানারই যথেষ্ট । এক্ষেত্রে আরো একটি অনুরোধ করবো দপ্তরের কাছে, এটা হচ্ছে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে যা আইনকানুন আছে তা যদি আপাততঃ বাংলাতে লিখে একটি লিফলেট অকারে প্রকাশ করে তা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা যায়, তাহলে এটাও খুব কার্যকরী পদক্ষেপ হবে । কেননা বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন । একেবারে ছোটবেলা থেকেই যদি আমরা ক্রেতাস্বার্থ বা ভোক্তাস্বার্থ নিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের কে সচেতন করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে কাজটি অনেক সহজ হয়ে উঠবে বলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি ।

ভোক্তাস্বার্থ এপ্রিল জুন ২০০৫ অর্থাৎ পঞ্চম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা রয়েছে অধিকার সুরক্ষার বিষয়টির সাথে সচেতনতা শব্দটি ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে । ভোক্তা সাধারন সচেতন না হলে তাদের অধিকার সুরক্ষা করা নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য । তাছাড়া, ১৯৮৬ সালের ভোক্তা স্বার্থ -সংরক্ষন আইনটি ২০০২ সালে সংশোধিত হয়েছে এবং এই সংশোধনীর দ্বারা এই আইনের বেশ কিছু ধারার পরিবর্তন করা হয়েছে , নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। এই বিষয়গুলি সর্ম্পকে এখনো আমাদের রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে খুব একটা আলোচনা নেই । ক্রেতাদের স্বার্থে ভোক্ত আদালতগুলির আর্থিক পরিধিও বৃদ্ধি করা হয়েছে । সব মিলিয়ে এটা একটা ধারাবাহিক সংগ্রাম । এই সংগ্রামে আমরা যদি স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যুক্ত করতে পারি তাহলে কাজটি খুবই সহজ এবং জনপ্রিয় হবে ।

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টা বলতে চাই তা হল আমাদের স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠ্যক্রমেই ভোক্তা স্বার্থ সংক্রান্ত কোন বিষয় এখনো যেহেতু স্থান লাভ করেনি সেহেতু এই বিষয়টি নিয়েও যথেষ্ট ভাবতে হবে । প্রথমে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসতে হবে । কারন বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন। ভোক্তা বা সাধারন একজন ক্রেতাকে ঠকানো আমরা প্রত্যক্ষ শোষন বলতে পারি । টাকা দিয়ে পরিষেবা না পাওয়া অবশ্যই একটি অপরাধ । উন্নত দেশগুলিতে এই সমস্ত বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে । ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্যদ কর্তৃপক্ষকে এটা বোঝাতে হবে যে, মানুষকে শোষন বা ঠকানোর বিরুদ্ধে চেতনা বৃদ্ধির জন্যই অন্ততঃপক্ষে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এই বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন । ষষ্ঠ সপ্তম এবং অষ্টমশ্রেণীতে ছোট্ট একটি অধ্যায় হিসেবে ক্রেতা স্বার্থ সংরক্ষন অবশ্যই রাখা যেতে পারে । বিশেষ করে সমাজবিদ্যার মধ্যে যে পৌর বিঞ্জান অংশটি আছে সেখানেই এই বিষয়টি রাখা যেতে পারে । অন্যদিকে নবম ও দশম শ্রেণীর ইতিহাস বা পরিবেশ পরিচিতির মধ্যেও বিষয়টি রাখা যেতে পারে ।

আমরা জানি পাঠ্যক্রম একটি গতিশীল বিষয় । কত নতুন নতুন বিষয় আজকাল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে । যেমন কম্পিউটার শিক্ষা , স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা, যৌন শিক্ষা , পরিবেশ পরিচিতি ইত্যাদি নতুন নতুন বিষয় আজকাল পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে । ফলে ভোক্তাস্বার্থ, আইনী সচেতনতা ইত্যাদি অনায়াসেই পাঠ্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে । সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে -সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও আমরা বিদ্যালয় স্তরে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অর্ন্তভূক্ত করেছি। এমনিভাবে ভোক্তা সংরক্ষন আইনটিও আমরা এর সঙ্গে যুক্ত করতে পারি ।

এই প্রসঙ্গে আরো কতগুলি বিষয় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাতে হবে । যেমন আই.এস.আই আগমার্ক ও এফ.পি.ও. চিহ্নগুলি কি ? আই.এস.আই. চিহ্ন সর্ম্পকে কোন অভিযোগ থাকলে কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে । বিশেষ করে ভোজ্য তেল, দুধ , ঘি মাখন ইত্যাদি যেগুলি আমরা গ্রহন করছি সেগুলির মধ্যে যদি ভেজাল থাকে, তাহেল আমরা সেই ভেজাল কী করে নির্নয় করবো ইত্যাদি বিষয়গুলিও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে হবে । এমনি করে জুয়েলারী দোকানে গিয়ে সোনারূপা কিনতে গিয়ে আমরা ঠকে যাচ্ছি কিনা এবং যে টাকা দিচ্ছি সেই টাকার সম পরিমান সোনা ইত্যাদি পাচ্ছি কিনা তাও আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে বোঝাতে হবে । কেন না এটা একটা সামাজিক আন্দোলন। তাছাড়া, আমরা যারা সমাজে বাস করি, আমাদের সবাই ক্রেতা । কারন যিনি বিক্রেতা তিনিই আবার অন্যদিকে ক্রেতা ।

তাই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বোঝাতে হবে যে কোন জিনিস কেনার সময় অবশ্যই ক্যাশমেমো বা রসিদ নিতে হবেএবং এই রসিদটিকে কিছুদিন সংরক্ষন ও করতে হবে । কেননা বিক্রেতার বিরুদ্ধে আমরা যদি মামলা করি, তাহলেও এই রসিদখানির প্রয়োজন হয়ে পড়বে ।

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরন দিচ্ছি। আমাদের রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় অসংখ্য ঔষধের দোকান আছে । জনগণ প্রতিনিয়তই ঔষুধের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় ঔষুধ কিনছেন। পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, আমাদের রাজ্যে বহু ঔষধ ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন কোন ঔষুধ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে এই ব্যাপারে আমরা অনেকেই সচেতন নই। যদি এমন হয় যে, কোন ঔষধের দোকান থেকে নিষিদ্ধ ঔষধ বিক্রি হচ্ছে, তাহলে ঠিক কোন জায়গায় কোন পদ্ধতিতে এই ব্যাপারে অভিযোগ আনতে হবে এ সর্ম্পকে অবশ্যই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে হবে। অনেকসময় হাসপাতালে কোন চিকিৎসক ভুল ঔষধ দিয়ে রোগীকে বলা চলে মেরেই ফেলল , তখন কোন পদ্ধতিতে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে এই ব্যাপারে ও আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচেতন করতে হবে ।

১৯৮৬ সালে ভোক্তা সংরক্ষণ আইনটি ভারতীয় পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করেছিল। কিন্তু আরো কিছু নতুন পরিষেবাকে যুক্ত করে ২০০২ সালে ঐ আইনটি আবার সংশোধন এবং সংযোজনও করা হয়েছে । ছাত্রদেরকে এই আইনটি সর্ম্পকে বলতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই ওদেরকে বোঝাতে হবে যে, ভোক্তা কারা, কেন আমি অভিযোগ জানাবো , কি অভিযোগ আমি জানাবো , কোন্ অভিযোগটি আমি কোথায় জানাবো , পরিষেবা পাওয়ার কতদিনের মধ্যে অভিযোগ জানাবো , এই অভিযোগ জানাতে গেলে প্রমান হিসেবে আমাকে কী কী সুযোগ সুবিধা হবে এবং এই ব্যাপারে আমাকে কী কী কাগজপত্র দাখিল করতে হবে ইত্যাদি বিষয় যদি আমরা সারা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে নিয়মমত আলোচনা সভা করে তাদেরকে বোঝাতে পারি তাহলে সত্যিই ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ে বা ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষনের ব্যাপারে একটা জনজারণ ঘটাতে পারবো, পারবো একটি সামাজিক আন্দোলন তৈরী করতে ।

আমাদের এই প্রিয় রাজ্যটিতে এখনো অনেক মানুষ আছেন যারা লেখাপড়া জানেন না। যাদেরকে আমরা নিরক্ষর বলি । একটা বিরাট অংশের মানুষ আছেন যারা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন। এই যে বিরাট অংশের মানুষ আমাদের রাজ্যে বাস করছেন তারা অনেকসময় নানাভাবে প্রতারিত হন। তাদেরকে ঠকানো খুবই সহজ। তারিখ পেরিয়ে যাওয়া কোন পণ্যও তাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া যায় । কারন তারা লেখাপড়া জানেন না । সমাজের এই অংশের মানুষ যাতে কোনভাবেই শোষিত বা প্রতারিত হতে না পারেন এই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার জন্য আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। তাহলেই ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষনের আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্যে আমরা পৌছতে পারবো । তা না হলে আমাদের অনেক সময় মাঝখানে ব্যয় হয়ে যাবে । পরিশেষে সকলের কাছে অনুরোধ করবো যে, আগামী পাঁচ বছরকে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করে সারা রাজ্যের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে । এটাই এই সময়ের দাবী ।

চেতনার সিঁড়ি বেয়ে

-- *হরিদাস দত্ত*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, জীবন যাত্রার মানকে আরও অধিকতর উন্নত করার লক্ষে চলছে এক বিরামহীন কর্মযজ্ঞ। ফলে প্রতিদিনই আমাদের হাতে আসছে ভোগ ও সেবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানাবিধি আধুনিক উপকরণ। আর এই সকল উপকরণ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করার জন্যে বিভিন্ন প্রস্তুত কারক, বিক্রেতা তথা সরবরাহ কারীদের মধ্যে চলছে এক অসম ও অসাধু প্রতিযোগিতা। এর ফলাফল আমাদের সবারই জানা। ভোক্তা হিসাবে আমরা এই সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে গিয়ে নিরন্তর বঞ্চনা ও প্রতারনার শিকার হচ্ছি।

ক্রমাগত এই বঞ্চনা ও প্রতারনার মাত্রা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ও রূপায়িত বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারী করণ নীতির মাধ্যমে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই যে সরকার কর্তৃক রূপায়িত এই সকল নীতির হাত ধরে দেশে বেনো জলের মতো ঢুকে পড়েছে ভোগ্য দ্রব্য ও সেবা ক্ষেত্রের বিভিন্ন বহু জাতিক সংস্থা, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্যে হচ্ছে যেন তেন উপায়ে ভোক্তাদেরকে বঞ্চিত করে অধিক মুনাফা অর্জন করা। এদের সাথে এক অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে আমাদের দেশীয় সংস্থা সমূহ। উভয়ের অস্তিত্ব রক্ষায় উদ্ভাবিত হচ্ছে ভোক্তা প্রতারনার নিত্য-নতুন কৌশল। এই প্রেক্ষাপটে নিয়ন্ত্রন মুক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থেকে সৃষ্ট কুফলের হাত থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষিত করার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার নড়ে চড়ে বসে। ফলশ্রুতিতে আমাদের হাতে আসে ভোক্তা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ এর মতো এক অভূত পূর্ব আইন যা একাধারে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী। কারন ইতিপূর্বে ভোক্তা সুরক্ষায় প্রচলিত আইন গুলো ছিল শাস্তিমূলক, ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তাদের কোন প্রকার রিলিফ দেওয়ার সংস্থান ঐ সকল আইনে ছিল না। কিন্তু ভোক্তা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ তে পন্য ও সেবা ভোগের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের ৬টি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষতি গ্রস্ত ভোক্তাদেরকে ত্রি-স্তরীয় **Quasi Judicial Mechanism** তথা ভোক্তা আদালত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতি দ্রুত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে উক্ত আইনে।

তথাপি ভোক্তাদের বঞ্চনার পরিধি কিন্তু ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেশী সুদ দেওয়ার নাম করে জনগণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। সাধারন মানুষ বেশী সুদ পাবার আশায় ঐসমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা রাখেন । ভারত সরকারের একটি তথ্যে জানা গেছে মেয়াদ শেষে উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলো অনেক ক্ষেত্রেই আমানতকারীদের নকল টাকা প্রদান করে। এভাবে বাজারে একদিকে যেমন নকল টাকা অবাধে প্রবেশ করছে, অপরদিকে আমানতকারী তথা ভোক্তাগণও প্রতারিত হচ্ছে। উক্ত তথ্যে আরও জানা যায় যে বাজারে বিক্রিত বিভিন্ন কোম্পানীর কম্পিউটার সেটের একষট্টি শতাংশই সঠিক মানের নয়। অনুরূপ ভাবে, পেট্রোলিয়াম জাত পন্যের ক্ষেত্রে ভেজাল মিশ্রিত দ্রব্যের আর্থিক মূল্য প্রায় পনের হাজার কোটি টাকা দাঁড়ায় প্রতি বছরে। তাছাড়া ভারতীয় মানক সংস্থার এক সমীক্ষায় দেখাগেছে যে বাজারে বিক্রিত সোনার গহনের ক্ষেত্রে অষ্টআশি শতাংশই কম ক্যারেটের অর্থাৎ বিশুদ্ধ নয়। আন্তজাতিক একটি

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ভারতবর্ষে অটোমোবাইল ক্ষেত্রে বিক্রিত যন্ত্রাংশের প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশই নকল তথা সঠিক মানের নয়। যার ফলে যান চলাচলের ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা বেশী দেখা দেয়। আরেকটি সমীক্ষায় দেখাগেছে ভারতবর্ষে বিক্রিত তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ঘড়ির মধ্যে মাত্র এককোটি কুড়ি লক্ষ ঘড়ি সরকার স্বীকৃত কারখানার তৈরী। আমাদের খাদ্য দ্রব্যে দুধ থেকে শুরু করে সবকিছুর মধ্যেই ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে এবং এর পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩ সালে ভারত সরকারের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আমাদের দেশে বিক্রিত ঔষধের মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশই যথার্থ গুনমানের নয়।

পৃথিবীর প্রথম মানুষটি স্বর্ণ নামক ধাতুটির সাথে পরিচিত ছিল না এবং সঙ্গত কারনে এর ব্যবহার ও তার কাছে অজানা ছিল । কিন্তু সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের সাথে সাথে আমরা এই অতি মূল্যবান ধাতুটির সাথে পরিচিত হই এবং এর অতি সহজ নগদে রূপান্তরযোগ্যতার কারনে সঞ্চয়ের মাধ্যম এবং অত্যন্ত জৌলুস তথা চাকচিক্যের কারনে অঙ্গ বিভূষনে অলংকার হিসাবে ব্যবহার করা আরম্ভ করি । ক্রমে ক্রমে গয়না হিসাবে এই ধাতুটির ব্যবহারে ব্যাপকতা আসে এবং সমাজে ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই তাদের নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী সোনার ব্যবহার আরম্ভ করে এবং গয়না নির্মাণকার্য শিল্পের মযার্দা লাভ করে । কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার যে ধাতু হিসাবে স্বর্ণ সহজলভ্য না হওয়াতে এবং স্বর্নালঙ্কার নির্মান শিল্পে বিশেষ ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হয় বলে এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরাই এই শিল্পের একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছে এবং তার ফলে ভোক্তা হিসাবে আমরা প্রতিনিয়ত স্বর্ণালঙ্কারের দাম, ওজন ও গুনমান এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতারিত হয়ে আসছি । এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে সোনার চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে । ১৯৮২ সালে যেখানে আমাদের দেশে সোনার আভ্যন্তরীন চাহিদা ছিল ৬৫ লক্ষ মেঃ টন, ২০০৪ -০৫ সালে তা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮০০ মেঃ টন । বর্তমানে ভারত বর্ষে প্রায় তিন লক্ষ সোনার রেজিষ্ট্রার্ড দোকান আছে এবং সেগুলোতে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক কর্মরত আছেন ।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে বিক্রিত সোনার ৮০ ভাগই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট ২০ ভাগের মধ্যে ১৫ ভাগ কারিগররা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করেন এবং ৫ ভাগ বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । সমীক্ষাটি বলছে ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্রেতাগণ প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছেন । যেমন - প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় বাজারে সোনার ক্রয় - বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হয় ১০ গ্রামের একটি এককের ভিত্তিতে । কিন্তু ভোক্তা হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা আনা বা ভরি এই এককে সোনা বা স্বণালঙ্কার ক্রয় বিক্রয় করে থাকি এবং এই একক সর্ম্পকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোন ধারনাই নেই । বিক্রেতা তার খেয়ালখুশিমত সোনার পরিমাপ এবং মূল্য নির্ধারন করে থাকেন । ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে । অত্যন্ত সুসংগঠিত ভাবে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদেরকে দিনের পর দিন প্রতারনা করা হচ্ছে । দ্বিতীয়তঃ বাজারে সোনার মূল্য নির্ধারিত হয় তার গুনমানের উপর । সোনার গুনমান প্রকাশ করা হয় ক্যারেট নামক এককের মাধ্যমে । সাধারনতঃ বাজারে ৯ ক্যারেট থেকে ২২ ক্যারেট এই বিভিন্ন গুনমানের সোনা পাওয়া যায় । ২৪ ক্যারেটের সোনা হচ্ছে বিশুদ্ধ সোনা, যার বাজার মূল্য সবচেয়ে বেশী আর ৯ ক্যারেটের সোনা হচ্ছে সবচেয়ে কম গুনমান সম্পন্ন সোনা যার বাজার মূল্য প্রচলিত সব ধরেনর গুনমান সম্পন্ন সোনার চেয়ে কম । সমীক্ষাটি বলছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রেতারা অধিক গুনমানের সোনার দামে অপেক্ষাকৃত কম-গুনমান সম্পন্ন সোনা সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতাদের প্রতারিত করে থাকেন।

তৃতীয়তঃ স্বর্ণালঙ্কারকে অধিক আকর্ষনীয় ও কারুকার্য মন্ডিত করতে প্রয়োজনীয় ঝালাই কর্ম সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ধাতু (পাইন) ব্যবহার করা হয় যা সোনার মোট ওজনের অর্ন্তভূক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান ফ্যাসান সর্বস্ব যুগে স্বর্নালঙ্কার কে অধিক আকর্ষনীয় করে গড়ার এক প্রতিযোগিতা চলছে । ফলে ক্রেতারা সোনার সাথে ঝালাই হিসাবে মিশ্রিত অনেক কম দামের ধাতু সোনার দামে কিনে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন । সমীক্ষাটিতে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ওজন, দাম ও গুনমানের ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রতারিত হয়ে আমাদের দেশের ভোক্তাগন বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার উপরে ক্ষতিগ্রস্থ হন।

২০০০-২০০১ সালে আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে , দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ , জয়পুর, ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ এবং কোলকাতা স্থিত নামকরা বিশিষ্ট স্বর্ণের দোকানগুলো শতকরা ৮৮ ভাগের ও বেশী ক্ষেত্রে তাদের বিক্রয়যোগ্য স্বর্ণালঙ্কারের বিশুদ্ধতা প্রমান করতে ব্যর্থ হয়েছে ।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে এগুচ্ছে । ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয় । বিশ্বায়ন, উদারীকরন ও বেসরকারীকরণের কবচ হাতে বেঁধে ভারতীয় অর্থনীতি অতি দ্রুত স্থির ও অবিচল পদক্ষেপে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসরমান । তারই সূত্র ধরে ১৯৯০ সালে ভারত সরকার স্বর্ণ নিয়ন্ত্রন আইনটি প্রত্যাহার করে নেয় এবং ২রা জানুয়ারী ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় রির্জাভ ব্যাঙ্কের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন গোল্ড এর নবমতম সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সারাদেশে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নিশ্চয় করতে ভারতীয় মানক ব্যুরো (বি.আই.এস) কে স্বর্ণের হলমার্কিং করার দায়িত্ব দেওয়া হবে । তারপর এ সর্ম্পকে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর ভারতীয় মানক ব্যুরো ২০০১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভারতবর্ষে স্বর্ণের হল মার্কিং প্রথা ধাপে ধাপে রূপায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহন করে ।

বস্তুতপক্ষে ২০০১ সালের এপ্রিল মাস থেকেই ভারতবর্ষে হল মার্কিং প্রথা চালু হয় এবং বর্তমানে আমাদের দেশে নয়াদিল্লী, বাঙ্গ্যালোর , কোচিন , ত্রিচুর , কালিকট , ত্রিবান্দম, সুরাট , ভাদোরা, মুম্বাই,পুনে ও কোলকাতায় মোট ৩৭টি হল মার্কিং কেন্দ্র চালু আছে । বিগত পাঁচ বছরে স্বর্ণের হলমার্কিং এর অগ্রগতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ।

বিষয়	৩১.০৩.০১পর্যন্ত	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
মোট লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে	১৮৫টি	২৮৬টি	৫৬০টি	৭৯৫টি	৯৩৫টি	১৪১০টি
হল মার্কিং সেন্টার এর সংখ্যা	৮ টি	১২টি	১৩টি	১৫টি	২৪টি	৩৬টি
হল মার্কিং কৃত স্বর্ণ দ্রব্যের আর্থিক মূল্য	০.৯৩৬ লক্ষ	৪.৭৬৬	১৪.৯৩লক্ষ	৩১.৪ লক্ষ	৬২.৪ লক্ষ	১১৫লক্ষ

বিঃদ্রঃ- ৩০.০৪.২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৫০৯টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং দেশে ৩৭টি হলমার্কিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ।

স্বর্ণের গুনগত মান সুনিশ্চত করনের মাধ্যমে ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষায় 'হল মার্কিং ' একটি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হিসাবে বর্তমানে বিবেচিত হচ্ছে । এই ব্যবস্থায় বিক্রয়যোগ্য প্রতিটি স্বর্ণালঙ্কারের গায়ে একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন দেওয়া থাকবে এবং উক্ত চিহ্নটি দ্রব্যের গুনমানের নিশ্চয়তা প্রদান করবে । 'হল মার্কিং' প্রকল্পের প্রত্যেক স্বর্ণালঙ্কার বিক্রেতাকে ভারতীয় মানক ব্যুরো থেকে লাইসেন্স নিতে হবে এবং এই লাইসেন্সের ভিত্তিতে উক্ত স্বর্ণালঙ্কার বিক্রেতা নির্দিষ্ট হল মার্কিং কেন্দ্র থেকে তাদের বিক্রয়যোগ্য স্বর্ণালঙ্কার গুলো হল মার্কিং করাতে পারবেন । এখানে এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে হল মার্কিং কেন্দ্রগুলির উপর ভারতীয় মানক ব্যুরোর অবাধ কর্তৃত্ব বহাল থাকবে এবং এক্ষেত্রে যেকোন অনিয়ম প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গন্য হবে । ভারতীয় মানক ব্যুরোর প্রচলিত আইন, বিধি ও নিয়ন্ত্রনাদেশের দ্বারা উক্ত হল মার্কিং কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হবে । এই হল মার্কিং কেন্দ্রগুলো বেসরকারী মালিকাধীনে থাকবে এবং হল মার্কিং এর জন্য লাইসেন্সধারী স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত হারে ফি আদায় করবে ।

২০ গ্রাম পর্যন্ত ওজনের স্বর্ণের জন্য	--	১৮ টাকা
২০ গ্রামের চেয়ে বেশী কিন্তু ১০০ গ্রামের কম	--	৫০ টাকা
১০০ গ্রামের বেশী স্বর্ণের জন্য	--	১০০ টাকা

বিদেশে প্রতিটি স্বর্নালঙ্কারের জন্য আলাদাভাবে দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে দ্রব্যের গুনমান, পরিমানও তার নক্সার উপর ভিত্তি করে, কিন্তু আমাদের দেশে স্বর্নালঙ্কার বিক্রি হয় ওজনের ভিত্তিতে। অপরদিকে, আমাদের দেশে অধিকাংশ স্বর্নালঙ্কারই তৈরী হয় ছোট ছোট স্বর্নালঙ্কার বা কারিগরদের মাধ্যমে। সারাদেশে অ-রেজিষ্ট্রিকৃত এ রকম লক্ষ লক্ষ স্বর্নকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ।

হল মার্কিং হলো স্বর্ণের বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সরকারী স্বীকৃতি এবং এই ব্যবস্থার দ্বারা ভোক্তাগণকে বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করা অনেকটাই সম্ভব হবে । তাছাড়া, এই ব্যবস্থা সারা দেশে সার্থকভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হলে আন্তর্জাতিক স্বর্ন বানিজ্যেও ভারতের আধিপত্য কায়েম হবে । অধিকন্তু এই ব্যবস্থায় একটি তৃতীয়পক্ষের দ্বারা স্বর্ণের বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় বলে স্বর্ণ বিক্রেতাদেরও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে ।

ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষা আইন অনুসারে ভোক্তা হিসাবে আপনার কিছু আইনগত অধিকার আছে, স্বর্নালঙ্কার ক্রয়করার ক্ষেত্রে আপনি প্রতিযোগিতা মূলক দামে আপনার পছন্দমত জিনিস ক্রয় করার পূর্বে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জেনে নিলে অনেক ক্ষেত্রেই আপনি প্রতারনার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন । বিশেষ করে দ্রব্যের গুনমান (ক্যারেট), পাইন ইত্যাদি সর্ম্পকে জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। এসব কিন্তু আপনার আইনগত অধিকারের মধ্যে পড়ে, এবিষয়ে ভোক্তা শিক্ষা পাওয়া আপনার আইনগত অধিকারের অঙ্গ । একথা নিশ্চয়ই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, শুধুমাত্র আইন বা কোন ব্যবস্থাদির দ্বারা কারোর অধিকার সুরক্ষিত করা যায়না । তাই আপনার সচেতনতাই আপনার সুরক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি। অবশ্য বঞ্চিত হলে আপনি ভোক্তা আদালতের শরনাপন্ন হতে পারেন ।

ঘুম থেকেই উঠেই প্রতারিত হচ্ছি

--পার্থ সেনগুপ্ত

কবিগুরু লিখেছিলেন যুগান্তকারী গান - "আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান" .... । মানব সভ্যতা যখন উচ্চতম শিখরে দেদীপ্যমান, এসময় আমরা সবাই শিক্ষিত অশিক্ষিত নারী পুরুষ জেনে শুনে ঠকে চলছি । মানুষ মানুষকে প্রতারিত করছে । ব্যবসায়ীরা নিজেদের ন্যায্য মুনাফার চাইতে অধিক মুনাফা করতে ঠকাচ্ছেন । ক্রেতাদেরকে ঠকানোর এই মনোবৃত্তি প্রতিহত করতে কিছু আইন আমাদের দেশে চালু আছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ক্রেতা স্বার্থে প্রণীত ভোক্তা সুরক্ষা আইন - ১৯৮৬ চালু আছে। উক্ত আইন অনুসারে ক্রেতাদের স্বার্থে পৃথক আদালত করা হয়েছে । ওই আদালতে সহজে এবং অবিলম্বে রায় পাওয়া যায় । তারপরও আমরা ঠকেই চলেছি । আইনের সাহায্য কিছুতেই নিতে চাই না । এ এক অদ্ভুত পলায়নপর মানসিকতা। প্রতারিত, ক্ষতিগ্রস্থ হবার পর বিচার পেতে চাই না কেন ?

ভোগবাদ জাঁকিয়ে বসেছে, চর্তুদিকে প্রলোভন । ব্যবসায়ীরা (নীতি -দায়হীন) আখের গোছাতে ব্যস্ত । ওজনে কম দেওয়া তো একটা রেওয়াজ । বাকী খাতায় ও যোগ বিয়োগে ইচ্ছাকৃত ভুল করা এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর অতি চালাকী তো আছেই । পেকেটের উপর লেখা সর্বোচ্চ দাম এর উপর কর ইচ্ছামতো বসিয়ে দাম নেওয়া, খারাপ জিনিসকে ভালো বলে চালিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি ঘটনায় আমর সবাই রোজই ঠকছি । তাছাড়া দরদাম না করে একশ্রেণীর লোক বাজার হাট করায় পরোক্ষভাবে সংখ্যাগুরু ক্রেতার লোকসান হচ্ছে । বিক্রেতারা চান ভাবুক, আলালের ঘরে দুলালের মতো দেদার পয়সাওয়ালা ক্রেতা, যারা দরদাম করে, হিসবে করে নিজের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে জিনিসপত্র কিনেন তারা খুব কমই সদ্‌ব্যবহার পান দোকানীদের কাছে ।

আমাদের এই রাজ্যে পণ্য কিনলে দোকানীদের কাছ থেকে সাধারণতঃ বৈধ রসিদ পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতারাও চান না । ফলে ঠকলেও প্রমান করতে পারে না অমুক দোকান থেকে অমুক জিনিস কিনেছেন । তাছাড়া মেমো চাইলেও দোকানীরা গড়িমসি করেন । ক্রেতা বুঝে ননারকম মন্তব্য করেন । এটা আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতা । বিল বা মেমো চাইলেই অনেক সময় বলতে শোনা যায় ট্যাক্স দিতে হবে । অথচ ট্যাক্স ধরেই তারা জিনিস বিক্রি করেন ।

ওজনে ফাঁকি, ন্যায্য করের চাইতে বেশী কর নেওয়া, প্যাকে পণ্যের দাম, তৈরীর তারিখ, ব্যাচনম্বর না থাকার ঘটনাও আকছার ঘটছে । উচিত দাম দিয়ে জিনিস কিনব অথচ আমি বৈধ ব্যবহার পাব না, বৈধ জিনিস পাব না, শুধুই ঠকব এটা তো হয় না । আসলে আমরা ক্রেতা হিসেবে সাধারন আইনকানুন জানি না, জানলে ও এড়িয়ে যাই ।

১৯৮৬ সালে প্রথম ক্রেতা সুরক্ষা আইন তৈরী করা হয় । তারপর এ পর্যন্ত গ্রাহকদের জন্য মোট ৯টি আইন হয়েছে । তারপরও পরিস্থিতি কিন্তু সেই তিমিরেই রয়েছে । রয়েছে রাজ্য ভোক্তা আদালত, জেলা থেকে রাজ্য এবং রাজ্য থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত ভোক্তা আদালত । দোষীকে শাস্তি, জরিমানা দিতে পারে এই আদালত।

সবই রয়েছে তবুও কেন ক্রেতারা ঠকছেন, প্রতারিত হচ্ছেন? বলা হয় সচেতনতার অভাব । বিক্রেতারা মুনাফা লোভী, আইনকানুন মানতে চায়না । কিন্তু সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় । ক্রেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিমাত্রায় সচেতন । আবার বিক্রেতাদের মধ্যে ভালো অংশ প্রচলিত আইন মেনে ব্যবসা করতে চান । তবুও লোক ঠকানো হচ্ছে । ক্রেতা- বিক্রেতা সর্ম্পক খারাপ হচ্ছে । সরকারী ভিজিলেন্স ব্যবস্থা খুবই দূর্বল । ভেজালদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনের ব্যবস্থা নেই । কিছু জরিমানা আদায় করে দায়িত্ব শেষ । কিন্তু যে ব্যবসায়ীর ২৬০ টাকা জরিমানা হল সে একদিনেই ওই অর্থ কড়া গন্ডায় ক্রেতাদের গলা কেটে উসুল করে নেয় । ফলে পরিস্থিতি কী হয় তা সহজেই অনুমেয় । বিশেষ করে ভেজাল একটা বড় অপরাধ । সেজন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার ।

আধুনিক সমাজে চাহিদার শেষ নেই । মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এমন জিনিসের তালিকা দিতে গেলে হয়তো রামায়ন · মহাভারতের মতো দুটি মোটা বই লিখতে হবে । বর্তমানে উৎপাদকেরা অবশ্য মানুষের চাহিদা সৃষ্টি করে । ভোগবাদে মানুষ অবশ্য মানুষ নয় । গ্রাহক হিসাবে ব্যবহৃত হয় । জমকালো, চটকদার, অশ্লীল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা সৃষ্টি করা হচ্ছে । বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারন, আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সবই ভোগবাদের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে । ক্রেতাদের চাহিদা, পণ্য কেনার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা প্রভাবিত করছে বিজ্ঞাপন । খুব ক্যালকুলেটিভ প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে মানুষের চাহিদাকে ।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সাধারন ক্রেতাদের নিজের বিবেচনা বোধকে প্রখর করে রাখা মুস্কিল । কিন্তু জোয়ারে ভেসে গেলে তো চলবে না । নিজের পণ্য বেছে নিতে হবে । প্রলোভনের শিকার হয়ে আমরা যেন প্রতারিত না হই, সে চেষ্টা থাকতে হবে ।

মানুষের মরণ আমায় আঘাত করে না,
করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।

--শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সরকার, ভোক্তা আইন ও সাধারণ জনগণ - কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

-- আশীষ দত্ত

সংবিধানের মূল ভাবধারায় অনুপ্রানিত এবং তাতে প্রদত্ত নীতি নির্দেশিকার যথার্থ অনুসারী আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ সারা বিশ্বে জনকল্যানকামী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত এমন একটি দেশ যার যাবতীয় কর্ম পরিকল্পনা স্বাধীনোত্তর কাল থেকে জনকল্যানের এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রচিত ও রূপায়িত হচ্ছে। ভোক্তা সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬ জনকল্যান তথা ভোক্তা কল্যানকল্পে প্রণীত এক অসাধরন আইন যেটি ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ এক আধুনিক সুরক্ষা কবচ হিসাবে বর্তমানে স্বীকৃত। জনকল্যান তথা ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো একটি দেশে, যেখানে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এখনও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে এবং যেখানে বাজার ব্যবস্থাপনা তার চূড়ান্ত কাম্যস্তরে পৌঁছতে পারে নি, সেখানে ভোক্তা সুরক্ষা আইন ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষায় কতটা সফল তা নিয়ে প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য এবং উৎপাদনের উপাদানগুলোর উৎপাদন কর্মে অবদানের যথার্থ মূল্যায়নের ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী সন্তোষজনক এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাদের ক্রয় ক্ষমতা এবং জীবন যাত্রার মানও অনেক উন্নত। পাশাপাশি, উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর বাজার ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত সুসংগঠিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ন প্রতিযোগিতার বাজার যেখানে ক্রেতাই বাজারে নিয়ন্তা এবং বিক্রেতা তার স্বার্থের অনুকূলে বাজার নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। সঙ্গতকারনেই উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনীতির স্বাভাবিক তত্ত্ব অনুয়ায়ী ক্রেতাদের স্বার্থ এমনিতেই সুরক্ষিত। নিত্য প্রয়েজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের স্বার্থের উপেক্ষা হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের জনগণের আর্থিক অবস্থা এবং প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক বিশ্লেষন করলে এক সম্পূর্ন বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে উৎপাদনের উপাদানগুলোর বিশেষ করে শ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। মজুরীর হার অত্যন্ত কম হওয়ার কারনে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এখনো স্বল্প মাথা পিছু আয় তথা স্বল্প ক্রয় ক্ষমতা নিয়ে দারিদ্রের সাথে এক বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত। এখানে প্রচলিত বাজার ব্যবস্থাপনা তাদের সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। পূর্নপ্রতিযোগিতার বাজারের অনুপস্থিতির কারনে দ্রব্য ও পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত বিক্রেতারাই শেষ কথা বলেন। মূল্য নির্ধারনে এখানে ক্রেতার কোন ভূমিকাই স্বীকৃত নয়। অপরদিকে, স্বল্প ক্রয় ক্ষমতার কারনে আজও গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অনেক মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রি এক সাথে নগদ মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করতে পারে না। তারা হয়ত ধারে ঐ সমস্ত পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে, নয়তো নির্দ্দিষ্ট পরিমানের পণ্যের পরিবর্তে নির্দ্দিষ্ট টাকার পণ্য সামগ্রি ক্রয় করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা জানেন না যে তিনি ঠকছেন এটা ভাবা খুব একটা সঙ্গত হবে না।

আমরা বলি শিক্ষার অভাবে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অনেক মানুষই অসচেতন - তার অধিকার সুরক্ষায় ব্যর্থ। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে একটুখানি ভাবা অত্যন্ত জরুরী। কারন প্রাকৃতিক কারেন জন্মলগ্ন থেকে নির্বোধরা ছাড়া বাকীরা সবাই চিন্তা করতে জানে এবং ভালো মন্দের পার্থক্য করতে জানে তা সে যতই প্রথাগত শিক্ষা বিবর্জিত হউক না কেন। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক অসহায়ত্ব আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষকে মানসিক ভাবে এতটাই পঙ্গু করে রেখেছে যে তারা ভাবে প্রতিবাদ করে তাদের কোন লাভ হবে না, শেষ হাসি তারা কোনদিনই হাসতে পারবেন না, তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে। তাই জাগো গ্রাহক জাগো এই ধরনের কর্মসূচীর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে যতদিন না সরকার সমস্যার মূল গভীরে গিয়ে তাকে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা করছে। ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষার পূর্বশর্তই হলো ক্রেতার আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি এবং আকাঙ্খিত স্তরের বাজার ব্যবস্থা স্থাপন আর তার পাশাপাশি প্রশাসনকে আরও বেশী জনমুখী করা যাতে করে সরকারের যাবতীয়, কল্যানমূলক কর্মসূচী গুলোর সুফল বাধাহীন ভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে যায়।

আজও আমাদের দেশে পরিষেবাক্ষেত্রের সিংহভাগই সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে প্রদত্ত পরিষেবার মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই সকল সরকার পরিচালনাধীন পরিষেবা প্রদানকারী দপ্তরগুলির কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে জনসহায়ক বা ভোক্তা সহায়ক মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ঢেলে সাজাতে হবে এই সকল দপ্তর গুলোকে।

রাজ্যের তথা সারা দেশের অধিকাংশ জনগণই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন, চাউল, লবন, কেরোসিন তৈল ইত্যাদির জন্য খাদ্য দপ্তরের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য দপ্তর গনবন্টন ও লক্ষ্যপূর্ণ গনবন্টন ব্যবস্থায় ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে এই সকল পণ্য সামগ্রী জনগণকে সরবারহ করে থাকে, কিন্তু গণবন্টন ব্যবস্থার নড়বড়ে ভিত্তির জন্য এর সুফল কাঙ্খিত মাত্রায় জনগণ ভোগ করতে পারছে না। ভারতীয় খাদ্য নিগমের দায়সারা মনোভাব, খাদ্যশস্য মজুদকরন ও তার পরিবহনের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সর্তকতা অবলম্বন না করা, রাজ্যের খাদ্য গুদাম ও ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে যথাযথভাবে পণ্যাদি মজুত না করা প্রভৃতি কারনে ভোক্তাগণ অপেক্ষাকৃত কমগুনমান সম্পন্ন পণ্য সামগ্রি পাচ্ছেন। সরকার যদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রি যথার্থভাবে মজুত করার সংস্থান সম্পন্ন ন্যায্যমুলের দোকানগুলোর জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণ করা সহ ডিলারদের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং এফ.সি.আই ও রাজ্যের খাদ্য গুদামগুলোতে খাদ্য মজুত করনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করেন তবে আর্থিক ভাবে অনগ্রসর গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অধিকাংশ জনগণের বঞ্চনার অবসান স্বাভাবিকভাবেই হবে।

পাশাপাশি, ওজনে কারচুপি ও খাদ্যে ভেজাল রোধে ওজন ও পরিমাপ দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর যাবতীয় দায়িত্ব ন্যাস্ত আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষাকল্পে এই দুটি গুরুত্বপূর্ন দপ্তরই তাদের দায়িত্বপালনে যথাযথ ভূমিকা গ্রহন করতে পারছে না উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে। এই দুটি দপ্তরকে উপযুক্ত ভাবে শক্তিশালী করতে পারার মধ্যে নির্ভর করে ওজনে কারচুপি ও ভেজাল যুক্ত পণ্যের হাত থেকে ভোক্তাদের যথাযথ সুরক্ষার বিষয়টি।

জনকল্যানে আইন থাকবে আর আইনের বিধান রূপায়নে আদালত থাকবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আইন আদালতের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কখনোই কাম্য নয় এবং তা কখনো সুশাসনের পরিচায়ক নয়। তাই সরকারের উচিত ভোক্তাগণকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ না দিয়ে সুদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে অধিকাংশ জনগণ তথা ভোক্তাগণ যারা অর্থনৈতিক কারনে নিজেরা নিজেদের ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে অপারগ তাদের স্বার্থ স্বাভাবিক ভাবেই সুরক্ষিত থাকবে আর প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতি সম্পন্ন ভোক্তারাই শেষ অস্ত্র হিসাবে ভোক্তা আদালতের শরনাপন্ন হবে।

" চালাকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ হয় না। "

--- স্বামী বিবেকানন্দ

পরিবেশ দূষণ- সভ্যতার অভিশাপ

-- নরেশ দত্ত

পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়টি আজ ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইনের অন্তর্গত। তথাপি আমাদের দেশে বিষয়টি আজও অবহেলিত। নির্মল পরিবেশে বেঁচে থাকা আমাদের জন্মগত অধিকার। পবিবেশ দূষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্ব সংস্থা (UNO) এটাকে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইনের অন্তর্গত করার জন্যে সুপারিশ করেছে।

পরিবেশ দূষন একটি অন্যতম বিশ্ব-সংকট । প্রতিনিয়ত বায়ু জল ও মাটিতে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতির ফলে মানুষ ও তার সম্পদের দারুন ক্ষতি হচ্ছে । শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিজ্ঞন ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথেই দূষনের কার্যকারন সর্ম্পক । যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপন, জনবিস্ফেরন, ব্যাপকহারে বনধ্বংস ও পারমানবিক জ্বালানীর যথেচ্ছ ব্যবহার ইত্যাদি কারনে ঋতু-আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। এর ফলে অতি খরা-বন্যা, বিভিন্ন রোগ ও মহামারী সহ জনস্বাস্থ্য সমস্যা এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে গোটা মানব সভ্যতাই বিপন্ন হয়ে পড়েছে ।

সূক্ষ্ম ধুলিকনা,ধোঁয়ার ছাইকনা, পরাগ ও ছত্রাকরেণু, পারদ, সীসা, তামা,লোহা ক্যাডিয়াম ইত্যাদি ভারী ধাতুর সুক্ষ্ম কণা পদার্থ তাছাড়া ধোঁয়ায় উপস্থিত বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস যথা কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নানা হাইড্রোকার্বন, সালফার ডাই-অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড , নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন , পার অক্সি - অ্যাসিটাল নাইট্রেট , মিথেন এবং নানান জাতীয় পদার্থ যেমন তুলা, অ্যাসবেসটোস, পাট ইত্যাদি ,বিভিন্ন পেস্টিসাইড , হার্বিসাইড লার্ভিসাইড পারমানবিক ধোঁয়া ও ছাই ইত্যাদির মাধ্যমে বায়ূদূষনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে । এসব দূষন পর্দাথের বেশীর ভাগই বায়ুমন্ডলের নিচুস্তরের জমা হয়ে ভূপৃষ্টের অতি কাছে থাকার ফলে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের দারুন ক্ষতি করেছে ।

পরিবেশ দূষণ থেকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এমাইফাইমিসা , সিলিকোসিস , নিউমোকনিয়োসিস, ব্ল্যাকলাং, হাঁপানির মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে । ধোঁয়া জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে শহরাঞ্চলের নীচু বায়ুস্তরের বাদামী ধূসর রঙের ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে । ধোঁয়াসায় উপস্থিত সূর্য্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অত্যন্ত ক্ষতিকারক শ্বাসরোগের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করে । বেঞ্জোপাইরিন নামক অপর একটি হাইড্রোকার্বন থেকেও এই ক্যান্সার হতে পারে । তাছাড়া রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস করে । বেঞ্জিন ও তার অপভ্রংশ , ফরমালিন ইত্যাদি ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। আম্লিক অক্সাইড স্বাসকষ্ট , ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়াল প্যারালাইসিস ও এলার্জির সৃষ্টি করতে সক্ষম। বায়ুদূষন পর্দাথ চোখের জ্বালা সৃষ্টি করে এবং লাল চক্ষু রোগ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী । বায়ুতে

দূষণজনিত কারনে উপস্থিত সীসা কিডনী ও লিভারের পক্ষে ক্ষতিকর এবং জনন তন্ত্র ও নার্ভ তন্ত্রের রোগও সৃষ্টি করে । ফেনল প্লীহা , লিভার ও রক্ত ধ্বংস করে জনন তন্ত্র ও নার্ভতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে। বায়ুদূষন প্রাণী এবং উদ্ভিদেরও ক্ষতি করে । তাছাড়া গাছের পাতাকে ধ্বংস করে তার বৃদ্ধি নষ্ট করে দেয়ে । অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যু বায়ুদূষনের একটি অন্যতম কারণ। গ্রীণ হাউস এফেক্ট এবং তার পরিনতিতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে । জ্বালানী থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া বায়ুমন্ডলের নিচু স্তরে জমে থাকে এবং এই গ্যাস গুলিকে গ্রীন হাউস গ্যাস বলা হয় । কেননা এগুলি সূর্যালোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যুক্ত অতি লাল রশ্মি শোষন করে ।

এই গ্যাসগুলির পরিমান বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব আবহাওয়ারপরিবর্তন ঘটছে । সাধারনতঃ বায়ুমন্ডলে অতিলাল রশ্মিগুলির খুব কম পরিমানই ভূ-পৃষ্ঠে পৌছতে দেয় । ভূপৃষ্ঠ থেকে ঐ সব রশ্মি গ্রীন হাউস গ্যাসগুলি থাকার কারনে উর্দ্ধ বায়ুমন্ডলে ফিরে যেতে বাধা দেয় ।এবং এগুলিকে ভূপৃষ্ঠে ফেরত পাঠিয়ে দেয় । ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে যায় । পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। যদি গ্রীন হাউস গ্যাস না থাকে তাহলে ঐ তাপমাত্রা -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়াবে । এই তাপমাত্রা গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে । গ্যাসগুলির অত্যধিক ঘনত্ব বায়ু দূষণের সম পর্যায়ভুক্ত, কারণ এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়ে । তার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন ঘটবে । এসব কারণে চিরতুষারবৃত্ত বরফ বেশী গলে গিয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে । ইতিমধ্যে অনেক শহর জলের তলায় যাচ্ছে এবং এই প্রবনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । ইতিমধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনুমান করা হচ্ছে ২১০০ সালে আরও ১.৪ থেকে ৫.৯ ডিগ্রী সেলসিয়াসবৃদ্ধি পাবে । গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলির ঘনত্ব বৃদ্ধি ও স্থায়ীত্ব ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং -এ অবদান ঃ

গ্রীণ হাউস গ্যাস	শিল্প বিপ্লবের পূর্বের ঘণত্ব ১৭৫০ এ.ডি	২০০০ সালে ঘণত্ব	বৃদ্ধি %	বায়ুমন্ডলীয় স্থায়ীত্ব বৎসর	গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী %
Co2	280 ppm	368 ppm	31	5-200	60%
CH4	700 ppb	1750 ppb	151	12	20%
N2O	270 ppb	316 ppb	17	114	6%
CFCs	0 ppt	282 ppt		45 260	14%

ppm= parts per million, ppb= parts per billion, ppt= parts per trillion

ইতিমধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর ১-২ সেন্টিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন বিঘ্নিত হবে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তারে আসবে বিরাট পরিবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বায়ুদূষনের অন্যতম কুফল হলো বায়ুমন্ডলের স্ট্রেটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তর হ্রাস এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ। বায়ুমন্ডলের উপরিস্তরে উপস্থিত ওজোন আবরন আমাদের সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মিকে শোষন করে তার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে । ওজোন স্তরটির পরিধি দূষণের ফলে ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে।

ওজোন স্তর কমার কারন হচ্ছে গ্রীন হাউস গ্যাস। এসব গ্রীন হাউস গ্যাস উর্ধাকাশে উঠে গিয়ে ওজোন অনুকে ভেঙ্গে অক্সিজেনে পরিণত করে দিচ্ছে । ওজোন গ্যাসের সঙ্গে বিক্রিয়ার সক্রিয় ক্লোরিন মূলক তৈরী করছে অতি বেগুনী রশ্মির উপস্থিতিতে । অতিবেগুনী রশ্মি মানুষের চামড়ায় ক্যানসার এবং চোখের ছানি সৃষ্টি করে এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে, গাছের খাদ্য তৈরীর সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে কমিয়ে দেয় । দেহকোষের জীনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং সমুদ্রজলের খাদ্য শৃঙ্খলকে বিনষ্ট করে দেয় ।

গাছ বা বন বায়ু দূষন দুভাবে রোধ করে , একদিকে গাছ অক্সিজেন দেয় এবং অপরদিকে কার্বনডাই অক্সাইড শোষন করে । বন ধ্বংসের ফলে তাই বায়ুর অক্সিজেনের মাত্রা কমে এবং কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে বায়ূ দূষন ঘটায় । ক্ষতিগ্রস্থ বনাঞ্চলের পুর্নগঠন এর সময় পাতাঝরা গাছ বা যেসব গাছের পরাগরেণু শ্বাসরোগ ঘটায় তাদের ব্যাপক হারে লাগালেও পরিবেশ দূষনের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ দুটি কারনে ১) শীতকালে ব্যাপক হারে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার ফলে বায়ুর অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে না এবং কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায় । তাছাড়া পরাগরেনু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে শ্বাস রোগের প্রকোপ ছড়ায় । ত্রিপুরায় বনায়নের নামে ব্যাপক হারে রবার, শাল, সেগুন ইত্যাদি পাতাঝরা বন সৃষ্টি ও অ্যাকাশিয়া বন সৃষ্টির ফলে তার পরাগরেনু হাঁপানি রোগের কারন হয়ে দাঁড়ায় ।

বায়ুদূষন নিয়ন্ত্রনে ব্যাপকহারে বনায়ন করা উচিত এবং কোন ভূভাগের এক তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল থাকা উচিত। ভারতে তা রয়েছে একসপ্তমাংশ। চিরসবুজ এবং অ-ক্ষতিকারক পরাগরেনু হয় এমন গাছ নির্ধারন করে বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগিয়ে বন সৃষ্টি করা সঙ্গত।

অটোমোবাইল থেকে জ্বালানীর ধোঁয়া যাতে বায়ুতে না মিশতে পারে তার জন্যে প্রত্যেক অটোমোবাইল ব্যবহারকারীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে বাধ্য করতে হবে যা বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক শহরে রয়েছে ।

বায়ুদূষনের পর জলদূষন ও মৃত্তিকা দূষন নিয়ে আলোচনা করা যাক্ । জল হল জীবনের একটি প্রধান উপাদান। জল দূষন সকল জীবজগতে এমনকি মাটিতেও ছড়িয়ে পড়ে । বিভিন্ন রোগ জীবানু , ক্ষতিকারক রাসায়নিক ও পারমানবিক পর্দাথ ইত্যাদি দ্বারা সাধারনতঃ জল দূষন ঘটে ।

প্রথমতঃ রান্নাঘর, টয়লেট এবং অন্যান্য বাড়ীঘরের তরল বর্জ্য পদার্থ নালা নর্দমার মাধ্যমে কাছাকাছি কোন নদী বা বড় জলাশয়ে সরাসরি মিশে যায়। ভারতের বহু নদী একই কারনে দূষিত হচ্ছে । বাড়ীঘরের বর্জ্য পদার্থ সাধারনতঃ জৈব বস্তু যা সহজেই পঁচে যায় এবং জলে ফসফেট, নাইট্রেট ইত্যাদি অধিক মাত্রায় মিশে যায় । সাবান বা ডিটারজেন্ট থেকেই এক্ষেত্রে বেশী দূষন ঘটে ।

দ্বিতীয়তঃ কলকারখানার বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বর্জ্য পদার্থ নিকটবর্তী কোন নদী বা জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হয় । এসব অধিকাংশই বিষাক্ত এবং জীবের দ্বারা অভঙ্গুর অর্থাৎ পঁচে না । তাছাড়া কারখানার জল সাধারনতঃ গরম থাকে । এর ফলে জলাশয়ে তাপমাত্রা ৮০ থেকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়। দূর্ঘটনাবশতঃ তৈলবাহী জাহাজ থেকে পেট্রোলিয়াম তেল জলে মেশার ফলে জলের উপরিতলে তেলের পাতলা আস্তরন পড়ে। এর ফলে, প্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদি জলে ভাসমান জীব মারা যায় । মাছ ও পাখীর মরক সৃষ্টি হয় বিস্তৃত এলাকায় । এর ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে জীবের অক্সিজেন চাহিদা (বাইলোজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড, বা বিওডি) এবং জৈব বা অজৈব বস্তুর উপস্থিতির ফলে রাসয়নিক অক্সিজেন চাহিদা বেড়ে যায় । এর ফলে জলজ ইকোসিস্টেম ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে খাদ্য-খাদক হস্তান্তরের ফলে বিষাক্ত রাসয়নিক পদার্থ শেষ পর্যন্ত খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের দেহে অধিক ঘনত্বে চলে আসে। জৈব - অভঙ্গুর বিষাক্ত পদার্থ ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে এক পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টিস্তরে কমপক্ষে দশগুন অধিক ঘনত্বে বাহিত হয়। এভাবে নিরামিষ ভোজীদের শরীরে ১০ গুন এবং আমিষ ভোজীদের শরীর প্রায় ১০০ গুন অধিক ঘনত্বে এসে দেহের স্নেহ বা ফ্যাট কলায় সঞ্চিত হতে থাকে। যার ফলে হৃদরোগ থেকে শুরু করে কয়েকশত রোগ সৃষ্টি হতে পারে । জলদূষনের ফলে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া ও ক্রিমি ঘটিত সংক্রামক রোগ যেমন জন্ডিস, কলেরা , ডায়েরিয়া, টাইফয়েড, অ্যামিউবায়োসিস রোগ হতে পারে । বিভিন্ন ধরনের পেষ্টি সাইড, বায়োসাইড , হার্বি সাইড পলিক্লোরিনেটেড বাই মিথাইল ক্লোরাইড সহ ভারী ধাতু যেমন আর্সেনিক, পারদ, সীসা, ক্যাডিয়াম ইত্যাদির মিশ্রন পেস্টিসাইড রূপে ব্যবহৃত হয় । পারদ দূষনের দ্বারা জাপানের মিনামাত্রা রোগে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ভারতের সিমাগো (গুজরাট) জেলায় ও অনুরূপ রোগ হয়েছিল। তাছাড়া আর্সেনিক নামক সস্তা ধাতুর মিশ্রনে তৈরী পোকার ঔষুধ ব্যাপকহারে শষ্যক্ষেত্রে ছড়ানোর ফলে ভূমিস্তরের জলে এর মাত্রা বৃদ্ধি ঘটে। যার ফলে বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে নলকূপের জল খেয়ে বহু লোক আর্সেনিক বিসাক্তকরনের শিকার হচ্ছে। বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে । এর কোন চিকিৎসা নেই । একমাত্র ঐ বিষাক্ত জল না পান করাই এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা । তাছাড়া তেজস্ক্রিয় প্রায় ৪৫০ প্রকার আইসোটোপ থেকে রেডিয়েশনের ফলে উদ্ভিদ,প্রাণী ও মানুষ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। উদাহরন স্বরূপ স্টোনশিয়াম-৯০, খাবারের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে দেহকলায় জমা হয়, যার ফলে ব্লাড ক্যান্সার, অস্থি টিউমার ও বন্ধ্যাত্ব সহ শিশু মৃত্যু ঘটতে পারে ।

জলদূষন রোধ করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহন আবশ্যক । নালা নর্দমার জল ও কলকারখানার জলের বর্জপদার্থ বিভিন্ন উপায়ে শোধন করে নদী বা সমুদ্র ও জলাশয় নিক্ষেপ করা উচিত । পেষ্টিসাইড ও রাসায়নিক সার এর ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে এবং বায়োলোজিক্যাল কন্ট্রোল ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে জলদূষন ও মাটি দূষন একই সাথে হচ্ছে ।

পরিবেশ দূষনের মধ্যে শব্দ দূষন বা নয়েজ পলিউশান একটি নতুন মাত্রা যোগ করে । তাৎক্ষনিক কাজের সঙ্গে সর্ম্পকহীন যে সকল শব্দে হৈ চৈ বা গোলমাল সৃষ্টি হয়, তাকেই সাধারনভাবে শব্দ দূষন বলা হয় । এর ফঁলে কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে, ভুলত্রুটি হয় । মনযোগ নষ্ট হয়, আসে বিরক্তি এবং হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে চমকে ওঠা বা কানের পর্দায় ব্যাথা বা ছিড়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে । দীর্ঘক্ষন ধরে শব্দ দূষনে থাকলে শারীর বৃত্তিয় নানাহ ত্রুটি ও অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়। হৃদপিন্ডের অসুস্থতা, গ্যাস্ট্রিক সমস্যা, শ্বাসপ্রশ্বাসে ব্যাঘাত, মাথা ব্যাথা, অনিদ্রা, হরমোনের সমস্যা, কীডনির সমস্যা, নানাহ মানসিক সমস্যা, অবসাদ ইত্যাদি দেখা দেয় । শব্দ দূষন মাতৃগর্ভের ভ্রুনের মস্তিস্কের পরিনতিতে বাধা সৃষ্টি হয় । দীর্ঘদিন শব্দ দূষনে থাকলে বধিরতাও দেখা দেয় । শব্দ শক্তি কানের মধে যে চাপ সৃষ্টি করে, তাকে ডেসিবল এককে প্রকাশ করা হয় । ভারতের সেন্ট্রাল পলিউসন কন্ট্রোল বোর্ড অঞ্চল অনুযায়ী শব্দ দূষনের মাত্রা নির্ধারিন করে দিয়েছে ।

শিল্পাঞ্চল	দিনের বেলা	রাত্রিবেলা
কারখানা	6-21 hr.	21 to 6
	75db	70db
ব্যবসাস্থল	65db	55db
বাড়ীঘর	55db	45db
নীরবস্থান	50db	40db

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে বর্তমান বিজ্ঞান উন্নত বিশ্বে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমী দেশগুলো এব্যাপারে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশ পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। এর অন্যতম কারণ হল পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে আমাদের দেশের জনগণ পশ্চিমী দেশগুলোর জনগণের ন্যায় সচেতন নয়। তাই আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা।

ভোক্তা বঞ্চনার ইতিকথা

শ্রীমতী শিপ্রা পাল

আমাদের প্রানধারনের জন্যে খাদ্য, জল, অন্যান্য পানীয়, ঔষধপত্র ও পরিবেশ একান্ত অপিরহার্য অথচ ত্রুটিপূর্ন তথা ভেজাল খাদ্য ও পাণীয়, ভেজাল ঔষধ এবং দূষিত পরিবেশ ইত্যাদির ফলে আমাদের জীবন বর্তমান সময়ে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন ! যেমন ধরুন - আমাদের দেশে প্রায় সকলই খাদ্য দ্রব্য তৈরী করার ক্ষেত্রে ভোজ্য তেল ব্যবহার করে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভোজ্য তৈল হিসাবে সরিষার তৈল সাধারনতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভোজ্য তেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারাত্মক ভাবে ভেজাল যুক্ত । স্বাস্থের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর কিছু রাসয়নিক দ্রব্য ভোজ্য তেলে ব্যবহার করা হয় । দিল্লীস্থিত একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে পচা পেঁয়াজ এর রস সহ নানাধরনের ক্ষতিকর দ্রব্যের নির্যাস সরিষার তৈলে ব্যবহার করা হয় । তাছাড়া, সরিষার তৈলে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ সৃষ্টি করার জন্য এক প্রকার ক্ষতিকর রাসয়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এজন্য প্রত্যেক কোম্পানীর সরিষার তৈল বাজারজাত করার পূর্বে উক্ত সরিষার তৈলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষাগারে যাচাই করা উচিত। ভোক্তাদের স্বার্থে সরিষার তৈল বাজারজাত করার পূর্বে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে উক্ত তেলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে শংসাপত্র নেওয়া উচিত। তাছাড়া, কৃষিকাজে অত্যধিক পরিমান রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যাদিতে অধিক পরিমানে উক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । ফলে শাক সব্জী ইত্যাদি থেকে নানাধরনের পীড়ার উৎপত্তি হচ্ছে। এমনকি এ সকল থেকে মারাত্মক ধরনের রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই, রাসয়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের জন্যে উদ্যোগ নেওয়া খুবই জরুরী বলে মনে হয় নতুবা এ সকল মারাত্মক ধরনের রাসয়নিক পদার্থ সৃষ্ট নানা ধরনের জিন ঘটিত রোগের আক্রমন থেকে আমাদের আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা যাবে না। আর বর্তমান প্রজন্ম যে নানা ধরনের ব্যাধির শিকার হচ্ছে তার কারন হিসাবে কীটনাশক দ্রব্যাদি ও রাসায়নিক সার অন্যতম বলে অনেক বিশেষজ্ঞগণ বলে থাকেন। তাই সমগ্র জাতির স্বার্থে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্রব্য কম ব্যবহার করে ব্যপকহারে জৈব সার ব্যবহারের জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন বলে মনে হয়। তাছাড়া, চাল, ডাল ও অন্যান্য ভোজ্য দ্রব্য মজুত করার ক্ষেত্রে ও যথাসম্ভব কীটনাশক দ্রব্যাদি কম ব্যবহার করা উচিত বলে আমার মনে হয় ।

বলা হয়ে থাকে জীবনের অপর নাম জল । জল ছাড়া মানুষ কিংবা কোন জীব বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর চার ভাগের তিনভাগই জলাশয়। তথাপি আমরা বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত । ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষা আইনে ভোক্তাদের ব্যাপক আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে । তন্মধ্যে ভোক্তা নিরাপত্তার অধিকারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন ।

একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের দেশের ভোক্তাগণ নিশ্চয়ই সরকারের কাছ থেকে তাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার অধিকারটি আশা করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও একথা সত্যি যে আমাদের রাজ্যে এখনও বিশুদ্ধ পাণীয় জলের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কীটনাশক দ্রব্য ও রাসায়নিক সারের মধ্যে অধিক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতির ফলে আমাদের দেশে অনেক অঞ্চলেই পানীয় জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে এবং যার ফলে ঐ সব অঞ্চলের মানুষ আর্সেনিক বিষযুক্ত জল পান করার ফলে মারাত্মক রোগের শিকার হয়েছে। আমাদের রাজ্যে এখন পর্যন্ত পানীয় জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি তথাপি অদূর ভবিষ্যতে এধরনের সম্ভাবনার বিষয়টি একেবারে বাতিল করা যায় না। তাই, সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোকে এব্যাপারে সর্তক থাকা উচিত। আমাদের রাজ্যে পানীয় জলে লৌহের উপস্থিতি একটি বিরাট সমস্যা অথচ আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট এখনো রাজ্যের সর্বত্র বসানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রত্যন্ত এলাকায় এখনো ডোবা, নালা, ইত্যাদির অপরিশোধিত নোংরা জল খেয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ দূরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েন। জনকল্যানকামী রাষ্ট্র হিসাবে সরকার এ বিষয়ে তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। সংক্ষেপে বলা যায় আমাদের রাজ্যে আমরা এখনো বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

আমাদের রাজ্যে ভোক্তা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ যথা সময়েই রূপায়িত হয়েছে এবং ভোক্তা সুরক্ষা আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্যে সরকারের তরফ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে । রাজ্যের চারটি জেলাতেই জেলা ভোক্তা আদালত গঠন করা হয়েছে । তাছাড়া রাজ্য ভোক্তা আদালত ও আগরতলায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছে। ভোক্তাদের স্বার্থে ভোক্তা আদালতগুলো অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে চলছে । বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো কে সহায়তা করার জন্য সরকারী তরফ থেকে ব্যাপক উদোগ গ্রহন করা হয়েছে। ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষা কল্পে ত্রিপুরা রাজ্য ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদ নিয়মিত ভাবে কাজ করে চলেছে। তথাপি আমাদের রাজ্যেই ভোক্তা সচেতনতার মান খুবই কম। তাই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বোধ গড়ে তোলার জন্য রাজ্যের ২৭টি উচ্চতর বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় ভোক্তা সংঘ গঠন করা হয়েছে। আমরা আশা করব সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি জনগণের ব্যাপক অংশের অংশগ্রহনের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যে ভোক্তা আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

বিশ্বাস যোগ্যতায় চাই নিবিড় যোগাযোগ

সুজয় রায়

যারা বাজারে বা দোকানে গিয়ে জিনিস কিনেন, তাদের কতজনের বাজার দর সম্পর্কে ধারনা আছে ? যদি বলি সবারই আছে, তাহলে ল্যাটা চুকে যায় । কিন্তু ক্রেতারা মনে করেন, তাদের চোখ কান খোলা আছে এবং বিক্রেতা কেউই তাদের ঠকাতে পারে না । এই ধারনা রাখাটা খারাপ নয় । অথচ দেখা গেছে অতি বিচক্ষন ব্যক্তিরাও বাজারে বা দোকানে এসে জিনিস কিনতে গিয়ে ঠকে যান। আজ এই ঠকে যাওয়ার পরিধিটা শুধু জিনিসের দামের ক্ষেত্রে নয়, খাটি-অখাটি, ভেজাল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ক্রেতারাই বহুক্ষেত্রে নাজেহাল হয়ে যান ।

খোলা বাজারে, শাকসব্জি, ফলমূল, মাছমাংস ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিচক্ষনতা শিক্ষিত ক্রেতাদের চেয়ে অতি সাধারন ক্রেতাদের অনেক বেশী । এর মূল উৎস হলো অধিকার ও সামাজিক অভিজ্ঞতা, বৈষয়িক অভিজ্ঞতা, সর্বোপরি পরিবারের কর্তার ঐতিহ্যবাহী অভিজ্ঞতা এবং পৈত্রিক সূত্রে তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকা। এখানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা বা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই নয়, মূলত এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজন লোকশিক্ষা । একসময় গ্রামের কবিরাজেরা রোগীর লক্ষণ দেখে কিংবা রোগীর নাড়ি টিপে বলে দিতে পারতেন প্রকৃতপক্ষে রোগীর আসল রোগ কি এবং লক্ষণ এবং প্রতিকার কি ? এছাড়াও বলে দিতে পারতেন রোগীর এই রোগ কতদিন স্থায়ী এবং রোগে আরোগ্য লাভ করতে পারবেন কিনা। বিষয়টি নানা অভিজ্ঞতায় ও রোগ সম্পর্কে অনুভূতির ফসল । এখানে ম্যাজিকটা হচ্ছে নিখুত পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তের অনুধাবন। আজকের খোলা বাজারগুলিও সেই ক্রেতা কবিরাজগণই সঠিক দ্রব্য সঠিক মূল্যে ক্রয় করতে পারছেন। এই বাজারে শিক্ষিত ক্রেতারাই সবচেয়ে বেশী সওদা করতে গিয়ে গোল খান । কিন্তু শিক্ষিত ক্রেতারা কী ঔষুধ বা মুদির দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে প্রকৃত জিনিস বা ন্যায্য দাম দিয়ে জিনিস কিনতে পারেন ? এক্ষেত্রে একধরনের ধোঁয়াশার মধ্যে ক্রেতাদের থাকতে হয় । যেমন ছাপানো দাম যা থাকে, সেই দামেই ক্রেতাদের জিনিষ কিনতে হয়। কোন জায়গায় সর্বোচ্চ দাম কত হবে তা নির্দিষ্ট করে পেকেটের গায়ে লেখা থাকে না। অথচ উৎপাদন স্থল থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জায়গায় পরিবহন খরচ বিভিন্ন হওয়ার কারণে দ্রব্যটির সর্বোচ্চ দাম বিভিন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু পেকেটের গায়ে শুধু মাত্র সর্বোচ্চ দামই লেখা থাকে এবং দোকানীরা ক্রেতার কাছ থেকে সেই দামটিই রাখেন। এই ধাঁধাটি সম্পর্কে অনেক ক্রেতারাই পরিষ্কার ওয়াকিবহাল নয় । এটা যদি শিক্ষিত ক্রেতাদের ক্ষেত্রে ঘটে তাহলে সাধারন ক্রেতারা তো আরো বুঝবেন না, এক্ষেত্রে সবটাই দোকানীর সততার (?) উপর নির্ভর করে থাকতে হয় ।

তেমনি আর একটি বিষয় প্যাকেটে জিনিসের এক্সপ্যায়ারি ডেট সম্পর্কে । ম্যানুফেকচার ডেট আছে, এক্সপ্যায়ারি নেই । আবার বলা আছে ম্যানুফেকচার ডেট থাকে ছয়মাস, কোনটা আবার থাকে বার মাস, কোনটা আবার তিনমাস । এই সব খুঁটি নাটি সবার পক্ষেই কি দেখা সম্ভব ? বিশেষ করে অতি সাধারন ক্রেতাদের পক্ষে ? এখানেও দোকানীর সততার উপর ক্রেতাদের নির্ভর করতে হয়। ঔষধের দামের সংগে কত পার্সেন্ট ট্যাক্স - যোগ হয়, তা এখন পর্যন্ত হয় অধিকাংশ ক্রেতাই জানেন না । ঔষধের দোকানে গিয়ে দোকানী যা দাম রাখবেন তাই ক্রেতাকে দিতে হচ্ছে ।

আমার মনে হয় সৎ দোকানদার বা ঔষধ বিক্রেতা প্রত্যেককেই ক্রেতার স্বার্থে দোকানের কাউন্টারে চার্ট রেখে দেওয়া উচিত, বিশেষ করে কোন ঔষধের উপর কত শতাংশ ট্যাক্স ধার্য্য করা আছে। আর এইসব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হওয়া উচিত । আমার মনে হয় তাহলে ক্রেতা- বিক্রেতাদের মধ্যে সম্পর্কের সুস্থ বাতাবরণ সর্বক্ষণের জন্যই বজায় থাকবে । এটাই এখন মূলতঃ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজারের ভারসাম্য রক্ষার প্রাথমিক ও প্রথম কাজ বলে আমার ধারনা ।

''মানুষের অন্ধত্বের মতো নিরক্ষরতা এই দুর্ভাগা দেশের হতভাগ্য জনগণের সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতম অভিশাপ''

---রবীন্দ্রনাথ

''মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশকেই ধর্ম বলে''

---স্বামী বিবেকানন্দ